সনাতন ধৰ্ম্ম

বঙ্গবাসী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের
অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্, এ,
প্রণীত।

১৩৪১.

মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

উৎসর্গ।

ঠাকুরের কাজ ভাবিয়া
এই গ্রন্থ লিখিয়াছি ;
ঠাকুরের চরণে
তাহা
অর্পণ করিলাম।
॥ ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

গ্রন্থকার।

কলিকাতা
৮৪, বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট
সুদর্শন যন্ত্রালয়ে
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন।

আমরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ জ্ঞান নিতান্ত অল্প বা নাই বলিলেও চলে। এই অভাব দূর করিবার জন্য এই পুস্তক লিখিত হইল; উদ্দেশ্য সফল হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে ইহার মূল উৎস শাস্ত্ররাজির অনুশীলন করিতে হয়। শাস্ত্রসমূহ বহুস্থলে দুরূহ ও গুরুমুখগম্য। বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রালোচনা করিলে শাস্ত্রার্থ অবগত হওয়া যায়। গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব বলিলেও চলে।

> যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
> তস্যৈতে কথিতাঃ হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

এই পুস্তক লিখিতে বহু গ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীভক্তিকৌস্তভঃ, মন্ত্রযোগসংহিতা, হিন্দুধর্ম্ম, World's Eternal Religion, An Advanced Text Book of Sanatan Dharma প্রধান। বিশেষতঃ শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে বিষয় বিভাগের ক্রম গৃহীত হইয়াছে এবং ঐ গ্রন্থের অনুসরণে দুএকটা পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ গ্রন্থদর্শনে আমার এই পুস্তক লিখিবার বাসনা হয়; সুতরাং উক্ত গ্রন্থপ্রণেতার নিকট সানন্দে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় ও বঙ্গবাসী কলেজের সংস্কৃতসাহিত্যের অধ্যাপক

পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহোদয় দেখিয়া দিয়াছেন ; এজন্য তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য, এই গ্রন্থে মুদ্রাকরপ্রমাদের বাহুল্য দর্শনে হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। যখন গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রাধীন তখন আমি দুরন্ত **Filariasis** রোগে পীড়িত হইয়া শয্যায় শায়িত ; সুতরাং ভাল করিয়া প্রুফ দেখিয়া দিতে পারি নাই। স্বীয় অক্ষমতা বশতঃ নানা ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গেল, সহৃদয় পাঠকগণ আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন ইহাই আমার একান্ত নিবেদন। ইতি

২৭, বেণিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা
মাঘ, ১৩৪১

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সূচী।

॥ শ্রী ॥

সনাতন ধর্ম্ম।

সূচনা

এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে যে ধর্ম্মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে? ভারতবর্ষ বিশেষতঃ ধর্ম্মপ্রাণ, ভারতের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য তাহার ধর্ম্মপ্রণালী ও দার্শনিক সাধনা; ভারতবাসীর প্রতিকার্য্যই ধর্ম্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে ও কালধর্ম্মপ্রভাবে আর্য্যসন্তান ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইতেছে। অনেকের ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই এবং জ্ঞানের চেষ্টাও নাই, অথচ তাঁহারা ধর্ম্ম নিরর্থক অনিষ্টকর কুসংস্কার বলিয়া তাহার পরিবর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আর্য্যসন্তান আর্য্যধর্ম্ম কি, তাহার কিছুই জানে না; মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ইস্‌লাম ধর্ম্ম কি তাহা জানে এবং সহজে বুঝাইতে পারে; খ্রীষ্টীয়ান্ তদীয় ধর্ম্মসম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন। কেবল হিন্দু স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি আছে?

সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের একটী বিশেষ নাম আছে—যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম, ইহুদীধর্ম্ম, খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম, জারথুস্ত্র ধর্ম্ম, ইসলাম ধর্ম্ম। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মের বিশেষ নাম নাই—ইহা কেবল ধর্ম্ম; সময় সময় ইহাকে আর্য্যধর্ম্ম —অর্থাৎ উদারধর্ম্ম, মহান্ ধর্ম্ম বলা হয়; অথবা সনাতন ধর্ম্ম অর্থাৎ চিরাচরিত ধর্ম্ম, পুরুষপরম্পরাগত ধর্ম্ম (এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ), এই ভাব হইতে সনাতন ধর্ম্ম নাম দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ এই ধর্ম্ম শিক্ষা

দিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নাম দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এই ধর্ম্মের নাম ধর্ম্ম; অগ্রগামী শব্দটী কেবল বৈশিষ্ট্য-বাচক। হিন্দুধর্ম্ম শব্দটী নিতান্ত অর্ব্বাচীন; প্রাচীন গ্রন্থের কোনস্থলেই হিন্দু কথা পাওয়া যায় না; অর্ব্বাচীন 'মেরুতন্ত্রে' 'হিন্দু' কথার উল্লেখ দেখা গিয়াছে। পারসীক সংস্পর্শে হিন্দু কথার উৎপত্তি; সিন্ধুর অপভ্রংশ হিন্দু। তাহা হইতেই হিন্দুস্থান বা হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দবী কথার উৎপত্তি।

'ধর্ম্ম' কথার ব্যুৎপত্তি দেখিতে গেলে যাহা ধরিয়া রাখে তাহাই যে ধর্ম্ম, কেবল এই অর্থই পাওয়া যায়।* সত্যকথা বলিতে কি মানুষকে যাহা ধরিয়া রাখে মনুষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইতে দেয় না,—মানুষই করে, তাহাই ধর্ম্ম লবণের যদি লবণত্ব না থাকে, তাহাকে আর যেমন লবণ বলা যায় না, সেইরূপ মানুষের যদি মনুষ্যত্ব না থাকে, তাহা আর মানুষ বলিয়া হইতে পারেনা। মানুষের মনুষ্যত্ব সম্পাদক গুণ তাহার ধর্ম্ম—এই মনুষ্যত্বের প্রেরণা যাহা হইতে হয়, সেই নোদনা লক্ষণাক্রান্ত বিষয়টী ধর্ম্ম। মানুষে ও পশুতে বিশেষ পার্থক্য নাই—কেবল এক ধর্ম্মই এই পার্থক্য আনিয়াছে; ধর্ম্মহীন মানুষ পশুরও অধম। মানুষের বৈশিষ্ট্য তাহার স্বাধীন সত্তায় ও জ্ঞানে। কর্ম্ম ও প্রচেষ্টাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্তিই ধর্ম্মের চরমফল বলিয়া কথিত হইয়াছে।

দুঃখের নিবৃত্তি ও সুখের সন্ধানে মানব একান্তভাবে ব্যস্ত; মানবকে পশুপাশ হইতে বিমুক্ত করাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। কারণ ইহাই স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে ধর্ম্ম ভিন্ন মানুষ মানুষই হইতে পারেনা। ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বা অসদ্ধর্ম্ম

* ধারণাৎ ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তি প্রজাঃ।—মহাভারতম্ কর্ণপর্ব্ব ৬৯।৫৯

লইয়া কথা উঠিতে পারে ; কিন্তু ধর্ম্মের একান্ত অভাব বা ন-ধর্ম্ম বলিয়া কোন কথা থাকিতে পারে না। যাহারা ধর্ম্মের সংস্রবে থাকিতে চাহেনা তাহাদের জীবন পশুর জীবন—

যেহেতু,—

আহার নিদ্রা ভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।

আর এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে জ্ঞান, তাহা পশুদেরও আছে। এজন্য চণ্ডীতে বলা হইয়াছে,—

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥

—শ্রীচণ্ডী ১।৩৬

আমরা আর্য্যসন্তান—বহুপুণ্যে মুক্তিক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়াছি। জড় হইতে চেতন শ্রেষ্ঠ চেতনের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ ; মনুষ্যের মধ্যে আবার আর্য্য শ্রেষ্ঠ। লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ পূর্ব্বক প্রাপ্ত মানবজীবন যদি হেলায় নষ্ট করি, তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি আছে? জন্মমাত্রই দুঃখের, জীবন দুঃখের, মানুষ হইয়া যদি মানুষ না হওয়া যায় তাহার মত দুঃখের আর কিছু নাই। এই দুঃখদাহজ্বালা এড়াইবার জন্য ধর্ম্মের শরণ লওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মময় অমৃতফল সেবনে মানুষ 'অমৃতত্বায় কল্পতে' ; আমরা তাহা ত্যাগ করিয়া ক্ষণবিধ্বংসি আপাতসুখদ ইতর ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন হইয়া ইহলোকসর্ব্বস্ব হইয়াছি আপনার মৃত্যুর জন্য সমাধিগহ্বর আপনিই রচনা করিতেছি। এই দুঃখশত সমাকুল ভীমভবার্ণবে আমরা পরমা-

ভয়প্রদ অশরণের শরণ ধর্মপোতের আশ্রয় লইতেছি না, কি আশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ?

ধর্ম্মের কি প্রয়োজন ? ত্রিতাপতপ্ত শোকদীর্ণ রোগজীর্ণ দীনদুঃখী মানবকে ডাকিয়া ধর্ম্ম বলিতেছেন,—"এস মানব, আমার নিকট এস ; আমার শরণ লও। আমার কোমল হস্তাবমর্ষণে তোমার সর্ব্বজ্বালা ঘুচিয়া যাইবে—আমিই গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সুহৃৎ—আমিই মাতা, পিতা, গুরু, সখা—আমার আশ্রয় লও ; 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' আমি থাকিতে তোমায় ভয় কি ?"

ধর্ম্মের প্রধান শত্রু অজ্ঞান বা মায়া বা বিষয় ভোগবাসনা। যতই কেন জ্ঞানের অভিমান কর,—মায়ার বন্ধন হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

> তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
> মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ॥

এই জন্যই বলে,—বিষ্ণুমায়া অতিক্রম করা সহজ কর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম সাধনার প্রথম কথা মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের প্রবল ইচ্ছা (মুমুক্ষুত্ব) ও বৈরাগ্য (সংসারে অনাসক্তি)। অবিদ্যানাশের জন্য সাংখ্যযোগী জ্ঞানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জ্ঞানলাভেরপ্রধান উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতি। ভক্তিযোগী ভক্তিদ্বারা বিষ্ণুমায়া অতিক্রমপূর্ব্বক ভগবদ্দাস্যই চরমসুখ মনে করেন এবং কর্ম্মযোগী জ্ঞানকর্ম্ম সমন্বয়ে ভক্তির অনুশীলন পূর্ব্বক ব্রাহ্মীস্থিতিরই সাধনা করিয়া থাকেন।

অনেকের ধারণা, কর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম ; কিন্তু কর্ম্ম ধর্ম্মাঙ্গ বটে ; কিন্তু ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব নহে। গঙ্গাস্নান, তিলকসেবা,

মাল্যধারণ, উপবাস, নিষিদ্ধভক্ষ্যবর্জ্জন, আহ্নিক, পূজাপাঠ, স্তোত্রাদি পাঠপ্রভৃতি ধর্ম্মাঙ্গ ; কিন্তু সমগ্র ধর্ম্ম নহে। যাঁহার মন ধর্ম্মময়, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক, কর্ম্ম বহুস্থলে ধর্ম্মের দ্যোতক বটে কিন্তু কর্ম্মই ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষণ নহে। কর্ম্মের উদ্দেশ্য ভাবশুদ্ধি—কর্ম্ম ধর্ম্মজীবন গঠনের সাহায্য করে ; এজন্য কর্ম্ম কোনমতে বর্জ্জনীয় নহে। কর্ম্মে যাঁহাদের প্রয়োজন নাই, তাঁহারা ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশে, নিষ্কামভাবে বা লোকশিক্ষার নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানকালে হিন্দুসমাজে ধর্ম্মাঙ্গকে ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করা যেমন এক সম্প্রদায়ের প্রধান দোষ হইয়া উঠিয়াছে অন্যদিকে তেমনি তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্ম্মের আচারগুলিকে একান্ত অনাবশ্যক আবর্জ্জনা মনে করিয়া সম্পূর্ণতঃ ত্যাগ করেন ইহাও অত্যন্ত শোচনীয়। এই ব্যাধির প্রকৃত ঔষধ ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা এবং ধর্ম্মসঙ্গত জীবনযাপন। মৌখিক আলোচনায় কোন ফলোদয়ই হইবে না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যাহা ধরিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অভাবে বস্তুর বস্তুত্ব থাকে না। মানবমাত্রেই জীব ; সুতরাং তাহার জৈব ধর্ম্ম সাধারণ হইলেও জৈবধর্ম্ম অপেক্ষা একটা বড় ধর্ম্ম আছে ; তাহা মানবধর্ম্ম। বস্তুভেদে ধর্ম্মভেদ হয়—সকলের ধর্ম্ম সমান নয়। যেমন প্রকৃতিভেদে ভেষজের ব্যবস্থা, সেইরূপ মনোগতগুণের তারতম্যানুসারে ধর্ম্মব্যবস্থা ; মানুষের যে পরিমাণে জ্ঞান আছে, পশুর তাহা নাই। পশুমানবের জৈবধর্ম্ম অনেকটা এক ; কিন্তু মানুষের তাহা অপেক্ষা অধিক অনুশীলনের বস্তু রহিয়াছে। এই মানবত্ব সম্পাদক গুণগুলির অনুশীলনই ধর্ম্ম। পশু ও মানবের প্রধান পার্থক্য—মানবের বিধি নিষেধ জ্ঞান আছে ; পশুর সে জ্ঞান নাই—আছে কেবল প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিমূলক জ্ঞান। পশু সহজ সংস্কারের বশ ; মানব সহজাত সংস্কারকে

জ্ঞানদ্বারা পরিমার্জ্জিত করিয়া থাকে। জ্ঞানই পশু ও মানবের পার্থক্য সম্পাদক। জ্ঞানের বৃদ্ধি ও জ্ঞানানুশীলন মানবের পরম ধর্ম ; সমষ্টিগত জ্ঞানরাশির নাম বেদ। এই বেদানুযায়ী জীবন নিয়ন্ত্রিত করাই সনাতন ধর্ম। বেদবোধিত শ্রেয়ঃ সাধনই ধর্ম—শ্রুতিপ্রমাণকো শ্রেয়ঃসাধনং ধর্ম্মঃ। বেদসম্মত স্মৃতি তন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম ও বেদানুকূল ধর্ম। কেবল গ্রন্থদৃষ্টিতে ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায় না। কেননা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও অসম্যক্ দৃষ্টিতে বহু সময়ে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিরোধ বলিয়া প্রতিভাত ; শাস্ত্রসমন্বয় একপ্রকার অসম্ভব বলিলে হয়। এক্ষেত্রে সাধুদিগের সম্মত ও আচরিত ধর্ম্মই সাধনীয় ; এই জন্যই শাস্ত্রবাক্য—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

অপরদিকে—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত ॥

বাস্তবিক বেদ, স্মৃতি, মুনিবাক্য কত বিভিন্ন পথের নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোনটা কাহার অনুষ্ঠেয়, তাহা মহাজনই বলিতে পারেন। ধর্ম্মের তত্ত্ব অতি গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত. মহাজন বা প্রকৃত গুরু—তোমায় যে পথে লইয়া যাইবেন—সেই তোমার পথ, তুমি সেই পথে চলিবে।

হিন্দুসমাজে আজকাল বহু মহাত্মা, অংশাবতার, পূর্ণাবতার, স্বামীজী, সন্ন্যাসী ও নানা সম্প্রদায় প্রভৃতি উঠিয়া দম্ভপূর্ব্বক আচার পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মের পরমতত্ত্বের প্রচার করিতেছেন দেখা যায়, তাঁহাদের কর্ত্তৃক স্বেচ্ছা[illegible] ও নিজ সুবিধামত ধর্ম্মমত প্রস্তুত করা হইতেছে; ফলে বুদ্ধিভেদ ও [illegible] ঘটিতেছে। এস্থলে এইটুকু পুনঃ পুনঃ মনে করিয়া রাখার প্রয়োজন যে যাহা শাস্ত্রসম্মত ও সদাচার প্রসূত তাহাই ধর্ম্ম ও তাহার বর্জ্জন পরম অধর্ম্ম। এই নিয়ম সাধারণতঃ প্রযোজ্য। অসাধারণ ব্যক্তির কথা আমরা বলিতেছি না। আচার বিশেষের স্বীকার বা ত্যাগ স্থানকালপাত্র বা এককথায় ব্যক্তিগত অধিকারের উপর নির্ভর করে। তবে আমাদের মতে শাস্ত্রসম্মত ও আচারপূত পথই অবলম্বনীয়; তাহাই জীবনে ধ্রুবতারার ন্যায় স্থির করিয়া রাখিলে কখনই অনুতাপ করিতে হয় না। কেবল শাস্ত্র বা কেবল আচার সকল সময়ে নিরাপদ পথ নহে। শাস্ত্রের সহিত যুক্তির প্রয়োজন এবং যুক্তি শাস্ত্রানুগ হওয়ার প্রয়োজন।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥
যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রন্তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণং কিং করিষ্যতি॥

কেবল শাস্ত্রদ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় হয় না; বিচারেরও আবশ্যক। বিচার যুক্তিসঙ্গত না হইলে ধর্ম্মহানি ঘটে। কিন্তু বিচার করিবে কে? যে কখন নিজের প্রতিকূলসত্যকে মর্য্যাদা দিতে শিখে নাই, তাহার আবার বিচার কি, যুক্তি কি? এই জন্যই বলা হইয়াছে—

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥

অর্থাৎ যুক্তি ও শাস্ত্র ইহারা শাস্ত্রের মূল। ইহাদিগকে যে অবমানিত করে, সে দ্বিজ হইলেও সাধুগণ তাহাকে ধর্ম্মপথ হইতে বহিষ্কৃত করেন, সে নাস্তিক, সে বেদনিন্দক। আজকাল মনের মত করিয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা হইতেছে, সেজন্য যে সকল বাক্য মনের অনুকূল সে সকলই কেবল শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করা হয়, অপর সকল পরিত্যক্ত হয়। এইজন্য বলা হইয়াছে,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

—গীতা ১৬।২৩

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি॥

—গীতা ১৬।২৪

অর্থাৎ শাস্ত্রবিধিকে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া স্বেচ্ছাচারে চলিতে পার, কিন্তু তাহাতে সিদ্ধিলাভ হইবে না, সুখ পাইবে না কোন শ্রেষ্ঠ-গতিও হইবে না। অতএব কার্য্য ও অকার্য্যের ব্যবস্থিতির জন্য শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। পূর্ব্বে শাস্ত্রের বিধান ভাল করিয়া জান তারপর তুমি কর্ম্মের অধিকারী হইবে। শাস্ত্রের বিধি সকলে জানে না, তাহা জানিতে হইলে মহাজনের শরণ লইতে হয়- একথার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশও এইবাক্য হইতে জানা যায়।

ধর্ম্মের লক্ষণ বিচারে মনু বলিতেছেন—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥

ধর্ম্মের বিচারে এই চারিটী কথা আসে—শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মপ্রসাদ। শ্রুতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য—পরে স্মৃতি ও সদাচার এবং সর্ব্বশেষে আত্মতুষ্টি।

যাহা উচ্ছৃঙ্খল অসংযত মানব সমাজকে শাসন করিতে পারে তাহাই শাস্ত্র।

শাস্ত্রের শিরোমণি বেদ—ইহার অপর নাম শ্রুতি। কারণ গুরু শিষ্যের শ্রুতিমূলে এই শাস্ত্র উপদেশ করিতেন এবং এই জ্ঞান শ্রুতি-সাহায্যে গৃহীত হইত বলিয়া ইহার নাম শ্রুতি। বেদ অনাদি ও আপ্ত। বেদ কাহারও রচিত গ্রন্থ নহে, ইহা ব্রহ্মদ্রষ্টা ঋষিদ্বারা প্রাপ্ত; ইহা "ভগবতঃ নিশ্বসিতমিব" বলিয়া খ্যাত। বেদ চতুষ্টয়ের নাম—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। মন্ত্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া বেদের যে আকার দৃষ্ট হয়, তাহাই ঋক্। ঋক্‌বেদগুলি মণ্ডলে ও অষ্টকে বিভক্ত এবং মণ্ডল ও অষ্টক সমূহ সূক্ত ও অনুবাকে বিভক্ত। যে বেদে ঋকের সংগ্রহ হইয়াছে তাহাই ঋগ্বেদসংহিতা। পূর্ব্বে বেদ এক ছিল; মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমগ্রবেদ চারিভাগে বিভক্ত করেন। দ্বিতীয় বেদ সামবেদ—সামন্ অর্থাৎ গান, গানের সুবিধার জন্য ইহা গ্রথিত। ঋগ্বেদের মন্ত্রপ্রয়োগকারীকে হোতা বলা হয়—হোতার সুবিধার জন্য ঋগ্বেদ। সামগায়কের নাম উদ্গাতা— উদ্গাতার সুবিধার জন্য সামবেদ।

যজুর্ব্বেদে মন্ত্রযোগজ্ঞানের সবিশেষ সাহায্য করা হইয়াছে; যজ্ঞ-কাণ্ডের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যজুর্ব্বেদসংহিতা সঙ্কলিত। যিনি

যজ্ঞের নায়ক তাঁহাকে অধ্বর্য্যু বলা হয়। যজ্ঞের প্রার্থনা, আহ্বান, পদ্ধতি, উপাদান, বেদী, ইষ্টকাদি, চমশ প্রভৃতি যজ্ঞ ও যজ্ঞোপবিষয়ক সকল কথাই যজুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে।

চতুর্থবেদ—অথর্ব্ববেদ, অথর্ব্ববেদ আঙ্গিরস ও ভৃগুবংশীয় সঙ্কলিত বলিয়া বিখ্যাত; ইহাকে ব্রহ্মবেদও বলা হয়। মন্ত্র তন্ত্র অভিচার ভেষজাদির প্রক্রিয়া এই বেদে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। এই বেদই আয়ুর্ব্বেদের মূলীভূত। যিনি সমস্ত যজ্ঞে তত্ত্বাবধান করেন এবং দোষাদি পরিদর্শনপূর্ব্বক তাহার ব্যবস্থা করেন তিনি ব্রহ্মা। যজ্ঞে চারিজন লোকের প্রয়োজন—হোতা, ইনি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আহুতি দেন, উদ্গাতা—ইনি সামগান করেন, অধ্বর্য্যু—যজ্ঞের সম্পাদন করেন, ব্রহ্মা—ইনি যজ্ঞে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সকলই পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

সমগ্র বেদ যেমন চারিভাগে বিভক্ত তেমনই আবার প্রত্যেক বেদ সাধারণতঃ দুইটী ভাগে বিভক্ত করা যায়—সংহিতা বা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। সংহিতাভাগে মন্ত্রের সঙ্কলন ও ব্রাহ্মণবিভাগে বেদের যজ্ঞীয় ব্যাপারের বিধিব্যবস্থা ও ব্যাখ্যা; ব্রাহ্মণের এক অংশ আরণ্যক, ইহা তৃতীয়াশ্রমী অরণ্যে পাঠ করেন এবং ইহার শেষাংশ উপনিষৎ, বেদের সারাংশ ও শিরোভাগ উপনিষদ্, ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা। আর্য্যদিগের যেমন চারিটী আশ্রম, এই চারি আশ্রমের পঠনীয় ও চারিভাগে এবং শেষভাগে পরাবিদ্যা—যল্লব্ধ্বাহপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। ঋগ্বেদের দুইটী ব্রাহ্মণ—ঐতরেয় (ইহার মধ্যে ঐতরেয় উপনিষৎ) ও কৌষীতকি (উপনিষদের নাম কৌষীতকি)। যজুর্ব্বেদের দুইটী ভাগ—কৃষ্ণ ও শুক্ল; এই দুইএর মধ্যে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ আছে। কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও আরও একত্রিশটী উপনিষৎও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। শুক্লযজুর্ব্বেদে শতপথব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যকোপ-

নিষৎ ও সন্তেরটী উপনিষদ্ আছে। সামবেদের তিনটী ব্রাহ্মণ—(তলবকার বা কেনোপনিষৎ) পঞ্চবিংশ বা তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ "ছান্দোগ্য জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ। অথর্ব্ববেদে গোপথব্রাহ্মণ, মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক, প্রশ্ন প্রভৃতি নানা উপনিষদ্ আছে। উপনিষদের মধ্যে দ্বাদশটীই প্রধান—১। ঐতরেয় ২। কৌষীতকি ৩। তৈত্তিরীয় ৪। কঠ ৫। শ্বেতাশ্বতর ৬। বৃহদারণ্যক ৭। ঈশ ৮। কেন ৯। ছান্দোগ্য ১০। মাণ্ডুক্য ১১। মুণ্ডক ১২। প্রশ্ন। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮টীর নাম পাওয়া যায়।

এই বেদশাস্ত্রের সম্যক্ জ্ঞানের জন্য ষড়ঙ্গ আলোচনা বিধেয়। এই ষড়ঙ্গ বেদাঙ্গ বলিয়া অভিহিত—শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ। শিক্ষাদ্বারা বেদের আবৃত্তির যথাযথ প্রণালীর শিক্ষা হয়। ছন্দে বৈদিক যতি ও ছন্দের গতি অবগত হওয়া যায়। ব্যাকরণে শব্দ ও বাক্যের সম্বন্ধাদির জ্ঞান হয়—এ বিষয়ে পাণিনির ব্যাকরণই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। জ্যোতিষের দ্বারা বৈদিক যাগযজ্ঞের যথার্থ কাল, তিথ্যাদি ও গ্রহনক্ষত্রাদির সন্নিবেশ জানা যায়। কল্পে বৈদিক মন্ত্রের যজ্ঞপ্রয়োগ বিজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে। নিরুক্তে বৈদিক শব্দের ধাতুগত অর্থের বিচার করা হইয়াছে। এই ষড়ঙ্গে বিশেষ অধিকার থাকিলে তবেই দুর্গম বেদারণ্যে প্রবেশলাভ করা যায়।

শ্রুতির পর স্মৃতির স্থান। "শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।" স্মৃতিগুলির মধ্যে আমাদের ধর্ম্মের যে বহিরস্বরূপ (form) তাহার বিশেষ আলোচনা হইয়াছে। স্মৃতিসংহিতার পূর্ব্বরূপ কল্পসূত্র। সূত্র তিনভাগে বিভক্ত—গৃহ্যসূত্র, শ্রৌতসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র। সূত্রাকারে ধর্ম্মের পদ্ধতিগুলি এই সকল সূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে। সংসারীর

কর্ত্তব্যগুলি গৃহ্যসূত্রে এবং কল্প ও শ্রৌতসূত্রে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের কথা লিপিবদ্ধ আছে। পরে এই ধর্ম্মসূত্রগুলি সংহিতাকারে সঙ্কলিত হইয়াছে —ইহার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের সকল ব্যবস্থা পাওয়া যায়। বর্ণধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, দায়ভাগ, দণ্ডবিধি এমন কি স্বাস্থ্যধর্ম্মবিধি ও নানা সংস্কার, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার, সকলই ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ প্রধানতঃ স্মার্ত্তবিধিরই অনুসরণ করিতেছে। হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব ও স্বরূপ বেদোপনিষদে প্রকটিত কিন্তু হিন্দুসমাজের স্বরূপ স্মৃতিশাস্ত্রে প্রকাশিত করা হইয়াছে। সংহিতাকারদিগের মধ্যে ভগবান্ মনুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এক্ষণে বিশজন সংহিতাকার ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের পুণ্যনাম প্রত্যেক কার্য্যে স্মরণ করা হইয়া থাকে।

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরা
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥

—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১৫

এই সকল স্মৃতিকারের সংহিতা হইতে বিষয় বিশেষ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক পণ্ডিতবর্গকর্ত্তৃক নানা নিবন্ধ রচিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব সমগ্র সমাজ শাসন করিতেছে। জীমূতবাহনের দায়ভাগ বিষয়বণ্টনের পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিতেছে। পশ্চিমাঞ্চলে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি বিশেষভাবে প্রচলিত। তথায় মিতাক্ষরা অনুযায়ী সম্পত্তি বিভাগের সমাধান হয়। অধুনা ইংরেজী আমলে হিন্দুব্যবস্থার কিছু কিছু

পরিবর্ত্তন ইংরেজী আইনে ও বিচারালয়ে বিচারপতির নির্দ্দেশ অনুযায়ী হইতেছে। ধর্ম্মান্তর গ্রহণে হিন্দু পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত হয়; কিন্তু ইংরেজী আইনে তাহা হইবার উপায় নাই। হিন্দুধর্ম্মে রাজাদেশও সমাজসংস্থানের খানিকটা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। রাজা বিধর্ম্মী ও বৈদেশিক; এস্থলে রাজকীয় শক্তি সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে যত অল্প হস্তক্ষেপ করেন ততই মঙ্গল। ১৮৫৭ সালের মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রে ঐ মর্ম্মের অভয়বাণী আছে; কিন্তু গৌরবিল ও সর্দ্দা আইনে হিন্দুসমাজ মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছে।

স্মৃতির পর পুরাণ ও ইতিহাসের কথা। পুরাণ ও ইতিহাসকে পঞ্চমবেদ বলা যায়। বেদে দ্বিজাতির অধিকার—পুরাণে সর্ব্বজাতির অধিকার। বেদের উপদেশ ও তত্ত্ব লোকশিক্ষার জন্য নানা আখ্যান ও আখ্যায়িকায় উপশোভিত হইয়া পুরাণ ও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুরাণে দেবদেবীর মাহাত্ম্য, ভক্তিতত্ত্ব, উপাসনাপদ্ধতি, নানাব্রত, ভারতের রাজবংশের পরিচয়, পুণ্যশ্লোক ঋষিমুনি ও রাজন্যবর্গের চরিত, শ্রীহরি-মহিমা, নানা অবতারের বিষয়, সৃষ্টি, প্রলয়, যুগধর্ম্ম, সদাচারপ্রসঙ্গ, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, স্বর্গ নরক চতুর্দ্দশ ভুবনের বর্নন, নানা ভেষজের বিবরণ (গরুড়পুরাণ), নানা তীর্থের কথা, সম্প্রদায়ের ইতিহাস প্রভৃতির বর্ণনা আছে। রামায়ণ ও মহাভারতকে ও ইতিহাস বলে—ইহাদের সম্পর্কে আর ও দুইটী গ্রন্থের কথা বক্তব্য। প্রথমটী যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ সম্বন্ধে একটী অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মহাভারতের উপসংহার স্বরূপ হরিবংশগ্রন্থের উল্লেখও এস্থলে কর্ত্তব্য। সাধারণ হিন্দুধর্ম্মের রীতিনীতি, উপাসনাপদ্ধতি ও সংস্কারের পরিচয় পুরাণ ও স্মৃতির মধ্য দিয়া পাওয়া যায়। যদি ও হিন্দুধর্ম্মের মূল সনাতন বেদ—তথাপি ইহার আধুনিক স্বরূপ পুরাণ, ইতিহাস ও স্মৃতির মধ্যে পাওয়া

যায়। প্রত্যেক জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ সেই জাতির জাতীয় সাহিত্যে পরিদৃষ্ট। গ্রীক্ জাতির এই আদর্শ ইলিয়াড ও ওডিসিতে, ইহুদীজাতির আদর্শ বাইবেলের পুরাতন পুস্তকে, খ্রীষ্টীয়জাতির আদর্শ বাইবেলে পাওয়া যায়—ভারতীয় আর্য্যের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির মধ্যে দৃষ্ট হয়। রামের ন্যায় পিতৃভক্ত, সীতার ন্যায় পাতিব্রতা, ভীষ্মের ন্যায় পিতৃভক্ত ব্রহ্মচারী বীর, অর্জ্জুনের ন্যায় শূর, ব্যাসের ন্যায় জ্ঞানী, নারদ হনূমান্, ধ্রুব, ও প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্ত, জনকের ন্যায় রাজর্ষি, বশিষ্ঠের ন্যায় ক্ষমাশীল, বিশ্বামিত্রের ন্যায় তপস্বী ভারতের আদর্শ। এই সকল আদর্শ কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই—এই সকল মহান্ ও পবিত্র আদর্শ প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদের জীবন গঠন করিতেছে। কবিবর ব্যাস বাল্মীকি কবে তাঁহাদের অমর আলেখ্য ভারতক্ষেত্রে অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন; তাহার পর হইতে প্রত্যেক কবি সেই ঋষি প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে প্রত্যেক ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের বিষয়ই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কবি কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের সুরদাস, তুলসীদাস কাশীদাস, কৃত্তিবাস এবং বর্ত্তমানযুগে মধুসূদন ও নবীনচন্দ্র সেই একই সুরে ঋষিজুষ্ট পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছেন।

পুরাণের লক্ষণ বিচারে বলা হইয়াছে যে পুরাণে পাঁচটী বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

সৃষ্টি, প্রলয়, বংশকথা, মন্বন্তর, বংশানুচরিত—ইহাই পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ পুরাণের সংখ্যা—আঠারটী মহাপুরাণ ও আঠারটী উপপুরাণ। ব্রহ্মপুরাণ, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, বায়ু, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড়। উপপুরাণ—সনৎকুমার, নারসিংহ, বৃহন্নারদীয়, শৈবরহস্য, দুর্ব্বাসা, কপিল, বামন, ভার্গব, বরুণ, কালিকা, শাম্ব, নন্দিকেশ্বর, সূর্য্য, পরাশর, বশিষ্ঠ, দেবী ভাগবত, গণেশ, হংস। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মহাপুরাণ বলিয়া খ্যাত।

পুরাণের পর দর্শনশাস্ত্রের কথা বলিতে হইবে। দর্শনগুলি ও আর্ষ—বেদ যেমন আপ্ত, অন্যান্য গ্রন্থগুলি সেইরূপ আর্ষ। দর্শনগ্রন্থকে অনেক সময় স্মৃতি পর্য্যায়েও ফেলা হয়। আমাদের দেশে ছয়টী (আস্তিক) দর্শন প্রচলিত আছে—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্ত।

গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েবহি॥

(অপর ছয়টী নাস্তিক—যথা আর্হত, চতুর্বিধ বৌদ্ধ ও চার্ব্বাক।)

যাহা দ্বারা তত্ত্বদৃষ্টি লাভ হয়, তাহাই দর্শন।—বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা কখন অতীন্দ্রিয় প্রকৃত সত্যার্থদর্শন হয় না। ঋষিবৃন্দ ধ্যানযোগে যে সত্য সন্দর্শন করিয়াছেন তাহারই ফলিতার্থ সূত্রাকারে দর্শনে নিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের এই দুঃখময় জীবনে কিরূপে জন্মমৃত্যুচক্র এড়াইতে পারা যায়, কি ভাবে আত্যন্তিক দুঃখনাশ ঘটে, কিরূপে আত্মদর্শন ঘটে, কোন্‌ভাবে স্বরূপে অবস্থান করা যায়, কি ভাবে ব্রহ্মনির্ব্বাণ ঘটে, জীব কে, আত্মা কি, আত্মার অস্তিত্ব, জগতের স্বরূপ সকলই দর্শনশাস্ত্রে বলা হইয়াছে। যাহা তত্ত্বের মূর্ত্তিতে, জ্ঞানরূপে,

সিদ্ধান্তাকারে, সূত্রনিচয়ে গ্রন্থে নিবদ্ধ, তাহাই সাহিত্যের আকারে, সরস কথায়, নানা আখ্যানে, নানা রূপকের আশ্রয়ে পুরাণ ও ইতিহাসে উপন্যস্ত হইয়াছে। ঋষিগণের কি প্রভাব! তাঁহারা জীবের অধিকার বিবেচনাপূর্ব্বক যাহার যেরূপ ক্ষমতা, তাহাকে তদনুরূপ দান করিয়াছেন। আমাদের ভাণ্ডারে যে মহার্ঘ রত্ন রহিয়াছে, আমরা তাহা বুঝিলাম না—এই বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার ফেলিয়া আমরা বিদেশের ক্যাণ্ট হেগেল, হার্ব্বট্ স্পেন্সারের দ্বারে ভিক্ষুকের ন্যায় পড়িয়া আছি। গৃহে চিন্তামণি রহিয়াছে—আমরা পরের দ্বারে কাচের ভিখারী হইয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ ব্যবস্থা যে ব্যাসকণাদগৌতমকপিলপতঞ্জলি-জৈমিনির দেশে, বুদ্ধশঙ্কররামানুজাচার্য্য পাদস্পর্শপূতক্ষেত্রে অদ্য বার্কলে হিউম, ক্যাণ্ট, হেগেল পড়িয়া ছাত্রবর্গ পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিতেছে। ইউরোপের দর্শন শুষ্ক জ্ঞানচর্চ্চা মাত্র—ইহা একটা মানসিক বিক্রমের আস্ফালন ক্ষেত্রস্বরূপ। কিন্তু ভারতীয় দর্শন জীবনের গঠন কার্য্যে সহায়তাপূর্ব্বক তাহাকে মনুষ্যজীবনের যে চরমফল, সেই ব্রাহ্মীস্থিতির অভিমুখে লইয়া যাইতেছে। মুণ্ডকোপনিষদের ভাষায়—

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ... ... পরা চৈবাহপরা চ। ... ...
অথ পরা যয়া তদক্ষরমভিগম্যতে।

ছয়দর্শনই জীবের ক্লেশনিবারণের উপায় নির্দ্ধারণে তৎপরে; সকল দর্শনই বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করে। সকল দর্শনই জ্ঞানই ভবব্যাধির একমাত্র ঔষধ বলিয়া নির্দ্ধারণ করে! ন্যায় ও বৈশেষিক নিঃশ্রেয়সের উপায় জ্ঞান বলিয়া প্রমাণ ও পদার্থের বিচারে ব্যস্ত, সাংখ্য ও পাতঞ্জলে জ্ঞানসাধনায় আত্মস্বরূপ প্রতিষ্ঠায় নিয়ত। সাংখ্যদর্শনে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব (প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার মনঃ পঞ্চতন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত) ব্যাখ্যাপূর্ব্বক মানবের ভ্রমজাল নিরাকরণে নিযুক্ত।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে কি ভাবে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিদ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করা যায়, এবং মীমাংসা-দর্শনে বৈদিক যাগযজ্ঞদ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপায় কথিত হইয়াছে। বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম—কিরূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটে এবং জ্ঞান সহকারে মায়ার নিরসন হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে, ইহাই বেদান্তের প্রতিপাদ্য।

ষড়দর্শনের পর তন্ত্র বা আগমের কথা আসিয়া পড়ে। কলিতে তন্ত্রমতই বিশেষভাবে প্রবল—বর্ত্তমানকালে হিন্দুজাতির উপাসনাকাণ্ডে তন্ত্র, পুরাণ ও স্মৃতিরই বিশেষ প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। তন্ত্রগুলি সম্প্রদায়-ভেদে বিভাগ করা যায়—বৈষ্ণবতন্ত্রগুলির মধ্যে পঞ্চরাত্র আগমের বিশেষ প্রাধান্য; পঞ্চরাত্র আগমের তুই একখানি গ্রন্থ ভিন্ন প্রায়ই কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের নিকট পঞ্চরাত্র-মতের বিশেষ প্রামাণ্য। দ্বিতীয়তঃ শৈবাগম—কাশ্মীর রাজদরবার হইতে সম্প্রতি বহু শৈবসিদ্ধান্তগ্রন্থ বা শৈবাগম প্রকাশিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ শাক্তাগম—তন্ত্র বলিতে সাধারণতঃ শাক্তাগমই বুঝায়। তন্ত্রের শিক্ষা গুরুমুখা—সাধারণের পক্ষে অগম্য; রহস্যাত্মক হিন্দুধর্ম্মের রূপ (esoteric Hinduism) তন্ত্রেই ব্যক্ত। অথর্ব্ববেদে ইহার মূল—বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের বহু সাধনা তান্ত্রিকসাধনার সহিত মিশিয়া গিয়া বর্ত্তমান তান্ত্রিকসাধনা বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে। মন্ত্রযোগ, ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি তন্ত্রের ক্রিয়া, ষটচক্রভেদাদি তান্ত্রিক-সাধন, হঠযোগাদির বিশেষ প্রয়োগ তন্ত্রশাস্ত্রে রহিয়াছে। তন্ত্রের পঞ্চমকার অধিকারিভেদে সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের ভেদে নানা আকার ধারণ করিয়া আছে। প্রবৃত্তিমার্গ দ্বারা নিবৃত্তিমার্গে যাওয়া ও জীবাত্মা পরমাত্মার সংযোগদ্বারা কৈবল্যপ্রাপ্তিই তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। তন্ত্রের

তালিকা বা সংখ্যা নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য—অত্যন্ত অল্পসংখ্যকই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত তন্ত্রই পুঁথির আকারে নানাস্থানে পড়িয়া আছে। বহু তন্ত্রই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কাশ্মীর, দ্রাবিড় ও বঙ্গদেশেই তন্ত্রের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তন্ত্রের সাধনা যেরূপ কঠোর, তান্ত্রিক সাধকও সেইরূপ বিরল। অধুনা সার জন্ উড্‌রফ্ আর্থার আভালোন্ এই ছদ্মনামে কয়েকখানি তন্ত্র স্বীয় সম্পাদনায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ধর্ম্মের উৎস বিচারে ভগবান্ মনু বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও চিত্তপ্রসাদ এই চারিটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক সদাচার বা সাধু মহাত্মাদিগের নির্দ্দিষ্ট মার্গ ও তৎপ্রবর্ত্তিত আচার ধর্ম্মনিরূপণে বিশেষ সাহায্য করিতেছে। যে সকল সাধু মহাত্মা নানা সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই সেই সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আচার ও বিচারের পূর্ব্বে সম্প্রদায় নির্ণয়ের প্রয়োজন, নচেৎ কোন বিষয়ের আলোচনা চলিতে পারে না। কলিতে সম্প্রদায়ভুক্ত না হওয়া যে দূষনীয় তাহা উক্ত হইয়াছে—সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ। যাঁহারা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহাদের আচারবিচারে শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রধান গ্রন্থ; ভক্তিশ্রদ্ধা প্রভৃতির আলোচনায় শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া পরিগণিত। তামিলভাষায় লিখিত শঠারিকৃত দ্রাবিড়বেদ বেদেরই ন্যায় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। পুষ্টিমার্গীয় ব্যক্তির নিকট ব্যাসসূত্রভাষ্য, পুষ্টি-প্রবাহমর্য্যাদা, সিদ্ধান্তরহস্য, অষ্টছাপ, বার্ত্তা প্রভৃতি সংস্কৃত বা হিন্দি গ্রন্থ পরম পবিত্র। নানকশাহীর নিকট আদিগ্রন্থই বেদ, কবীরপন্থীরা , শাখী, রমৈণী প্রভৃতি গ্রন্থ স্বমতমণ্ডনের জন্য ব্যবহার করিয়া

থাকেন। এইভাবে দেখা যায় যে বিরাট্ হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত নানা সম্প্রদায়ের নানা গ্রন্থ শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া আছে। হিন্দুধর্ম্ম অপার মহাসাগর বিশেষ—নানা সম্প্রদায় ইহার সাগর, উপসাগর, আবর্ত্ত ও প্রবাহসঙ্ঘমাত্র। এই ধর্ম্মে সকল অধিকারীর, সকল মতের, সকল ভাবের, সকল শ্রেণীর অদ্ভুত সমাবেশ। ইহা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম—ইহার মূল অক্ষয় ও সনাতন, ইহার রক্ষিতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ইহার মুখ ভূদেব ব্রাহ্মণগণ, ইহার বাহু ক্ষত্রিয়বর্গ, ইহার উরু বৈশ্যগণ, ইহার পাদদেশ শূদ্রগণ। এই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যুগযুগান্তের অত্যাচারে এখনও সতেজ ও সজীব রহিয়াছে—ইহা অব্যয়, অক্ষয় ও অবিনাশী। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

আমরা সেই শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক গ্রন্থসূচনা করিলাম—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

ওঁ তৎসৎ॥ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু॥ ওঁ স্বস্তি॥

উপক্রমণিকা।

সূচনায় ধর্ম্মের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে—ধর্ম্মের স্বরূপে ও সনাতন ধর্ম্মে বিশেষ পার্থক্য নাই; মূলকথাটী নানাভাবে পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট হইয়া সনাতন ধর্ম্মে ব্যক্ত হইয়াছে। মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধন ধর্ম্মের উদ্দেশ্য—এই মনুষ্যত্বের সাহায্যে দেবত্বপ্রাপ্তি বা পরমসুখলাভ বা আত্যন্তিক দুঃখনাশ, ইহাই সনাতন ধর্ম্মের মূল কথা। দুঃখনাশ ও সুখপ্রাপ্তি সর্ব্বদেশেই মানবের চরমকাম্য—সকলেই দুঃখতাপদগ্ধ, কেহই স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে। নানাভাবে দুঃখদূর করিবার বহু চেষ্টা হইতেছে। রাষ্ট্রের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বদুঃখ দূর হইবে মনে করিয়া রাষ্ট্রীয় নীতি সংস্কারে বহু লোক মনোযোগী হইয়াছেন। কেহ বা সমাজের রীতিনীতিগুলির আমূল সংস্কারপূর্ব্বক সমাজে সুখ-সঞ্চারের চেষ্টা করিতেছেন। কেহ বা অর্থনীতির দিক্ দিয়া কিরূপে সর্ব্ব-বিষয়ে সুখসমৃদ্ধি আনা যায়, তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল আন্দোলন বা প্রচেষ্টা আধুনিকযুগে আধুনিক রীতিতে প্রচারিত হইতেছে। ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম্ম এই সকল ভাব অবলম্বন না করিয়া তাহার মৌলিক বা নিজস্ব রীতি অবলম্বন করিয়াছে। মানবের সুখ তাহার নিজস্ব বা আত্মবশ; বাহিরের বস্তুর উপর সুখসমৃদ্ধি নির্ভর করে না। সুখদুঃখ সকলই আপেক্ষিক শব্দ (relative term); ইহার কোন সংজ্ঞা নাই—সুখদুঃখ কাহাকে বলে তাহা লইয়া নানামত। একজনের নিকট যাহা শ্রেয়ঃ ও প্রেয় অপরের নিকট তাহা হেয় ও অগ্রাহ্য; বস্তুতঃ কোন বস্তুবিশেষে সর্ব্বাঙ্গীন সুখ নাই; প্রত্যেক

বস্তুতেই সুখ ও দুঃখ সংমিশ্রিত রহিয়াছে। অর্থের আগমে যেরূপ সুখ ইহার অর্জ্জনে সংরক্ষণে সেইরূপ দুঃখ। অর্থ যেরূপ পরমার্থ সেইরূপই আবার অনর্থ ; প্রত্যেক বস্তুরই বিচারের এইরূপ সুখ ও দুঃখ মিশাইয়া আছে। রাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্ত্তনে যদি সুখ হইত তবে আমেরিকার দুঃখ ঘুচিত—বেকারের সংখ্যা লুপ্ত হইত। সমাজনীতি সংস্কারে যদি তাহা পাইতাম, তবে ইয়োরোপে যে স্থলে স্ত্রীপুরুষে বৈষম্য নাই, জাতিভেদ নাই, বিবাহবিচ্ছেদ চলে, বিধবাবিবাহ হয়, সে দেশে সামাজিক সুখের পরাকাষ্ঠা দেখা যাইত। কিন্তু এ সকলে মানবের আত্যন্তিক দুঃখনাশ ঘটে না ; এ ভাবের সাধনার সীমা নাই। এসকল খণ্ডপ্রচেষ্টা ও সাময়িক ব্যাপার—ইহাতে মানবের চিরন্তন দুঃখ যাইবার নহে—সুতরাং যাহা নিত্য ও সত্য, শাশ্বত ও সনাতন, সেই পথে যাইতে হইবে। 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি' এই কারণে ভারতের সাধনা আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদুঃখনাশের পথ দেখাইতেছে—মানুষ যাহাতে মানুষ হয়, দেবতা হয়, আপনার সন্ধান পায়, অমৃতের স্বাদ লাভ করে, সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি করে—রসং লব্ধা হ্যেবায়মানন্দী ভবতি—যাহা পাইলে আর অধিক লাভ চাহেনা—সেই স্বারাজ্য সিদ্ধির পথ দেখায়। মানুষের সুখ তাহারই করায়ত্ত—ধর্ম্মের আশ্রয় তাহার প্রধান আশ্রয়। আলেয়ার আলোকে দিগভ্রান্ত না হইয়া ধর্ম্মের স্থির ও ভাস্বর জ্যোতিঃ অনুসরণ করিলে লক্ষ্যহীন হইয়া ঘুরিতে হইবে না।

ধর্ম্মের দুই মূর্ত্তি—ব্যক্ত ও অব্যক্ত ; ব্যক্তমূর্ত্তি সমাজশরীর অবলম্বন পূর্ব্বক ফুটিয়া উঠে ; ধর্ম্মাবলম্বীর আচারবিচার ব্যবহার, সাধনা, চিন্তার ধারা, নৈতিক সংস্কার, দৈনন্দিন জীবন প্রভৃতির মধ্যে ধর্ম্মের যে বাহ্যরূপ ফুটিয়া উঠে, তাহা ব্যক্তস্বরূপ। যে মূলনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মের

বাহ্যরূপ বিকশিত হয়, তাহাই ধর্ম্মের প্রাণ। আমাদের এই সনাতন ধর্ম্মকে শাস্ত্রে 'ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার মূল স্বয়ং শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা বাসুদেব ও ব্রাহ্মণগণ। শ্রীভগবান্ ইহার মূল—ইনি ব্রহ্মণ্যদেব, গোব্রাহ্মণ হিতকারী ও জগদ্ধিতকারী। ধর্ম্মের মূল শ্রীভগবান্ ও শ্রীভাগবত সম্প্রদায় ব্রাহ্মণবর্গ। আমরা প্রথমে এই ধর্ম্মের মূল স্বরূপ বর্ণনা পূর্ব্বক ধর্ম্মের যে বহিরঙ্গরূপ তাহার আলোচনা করিব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্ম।

ধর্ম্মের মূল, জগতের মূল, সর্ব্বকারণ কারণ, একমাত্র নিত্য সত্য অবিনাশী সনাতন ব্রহ্ম। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—যাহা হইতে এই বিশ্ব জাত। এই ব্রহ্ম হইতে জীবসঙ্ঘ ও জগৎ জাত, পুষ্ট ও ইহাতে বিলীন হইবে। শ্রুতিতে তজ্জলান্ বলিয়া ব্রহ্মের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তজ্জ—তাহা হইতে জাত, তল্ল-তাহাতে লীন হইবে, তদন-তাহাতেই রহিয়াছে—in whom we live, move and have our being. তিনি আছেন সেই জন্য আছি—তিনি না থাকিলে আমরা থাকিতাম না। ব্রহ্মই সত্য, 'ব্রহ্ম সত্যং'—তাঁহারই সত্তায় জগৎ আছে। প্রমাণ কি তিনি আছেন? তিনি আছেন বলিয়া আমরা আছি। জন্মাদ্যস্য যতঃ—নচেৎ বিশ্ব জন্মিল কোথা হইতে? শ্রুতি বলিতেছেন—তিনি আছেন তদ্বাক্যে বিশ্বাসই আস্তিক্য বুদ্ধি। তিনি অন্তর বাহির, ঊর্দ্ধ অধঃ দিগ্বিদিক, সম্মুখপশ্চাৎ, সকলই পূর্ণ করিয়া আছেন। শ্রুতি তাঁহাকে বিধি নিষেধমুখে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মের ত সংজ্ঞা দেওয়া যায় না—তাহা যে মুকাস্বাদনবৎ, বোবায় স্বাদ গ্রহণ করে, কিন্তু বলিতে পারে না। যে পাইয়াছে বলে সে পায় নাই, যে জানে বলে সে জানে নাই, যে জানেনা বলে সেহ জানে, যে পায় নাই, সেই পাইয়াছে। যে এ রস পাইয়াছে সে যে অমৃত হইয়া গিয়াছে—অমৃতত্বায় কল্পতে। ব্রহ্ম অনন্ত রসঘন, সে ব্রহ্মধারার কে বর্ণনা করিবে? কোনটা বাদ দিয়া কোনটা ধরিবে? নেতি নেতি—ইহা নয়, ইহা নয়। তবে

কি ? সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—সকলই ব্রহ্ম, অণু পরমাণু হইতে 'ব্রহ্মপুরন্দর-দিনকররুদ্রাঃ' সকলই সেই ব্রহ্মবিন্দুর কিরণকণা। ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আর্য্য ঋষিরা পাগল হইয়া গিয়াছেন—তিনি শুনেন কিন্তু অকর্ণ, দেখেন কিন্তু অচক্ষু, অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, তিনি অণু হইতে অণু, আবার তিনি মহান্ হইতে মহান্। শ্রুতি বলিতেছেন, তাঁহার রূপ নাই, তিনি অরূপ ; আবার সেই অরূপের কি অপরূপ রূপই দেখাই-তেছেন। তাহার রূপের কণায় সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে, 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'। তিনিই সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বশুচি—তিনি সচ্চিদানন্দঘন, রসময়—রসং লব্ধা হ্যেবায়ং আনন্দী ভবতি। তিনি আনন্দময়, তিনি সৎ, তিনি চিৎ, তিনি আনন্দ, আবার অবস্থা ত্রয়াতীত তিনি অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয় গূঢ়, যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। এই ব্রহ্ম বস্তুর যুক্তি নাই তর্ক নাই, জল্পবাদ বিতণ্ডা নাই। এস ক্ষুধিত, তৃষিত, আর্ত্ত, এই ব্রহ্মসরোবরের বিন্দুপান কর, ত্রিতাপ দূর হইবে। অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—চেষ্টা কর, নিষ্ঠা রাখ, মিলিবে। যাগযজ্ঞে নয় (ন বহুনা শ্রুতেন), তিনি যখন দয়া করেন, তখনই পাওয়া যায়। তিনিই পান যমেবৈষ বৃণুতে তস্যৈং স্বাম্। ব্রহ্মবস্তু কি কথায় পাকে-প্রকারে মিলিবে ? ব্রহ্মসাধন না হইলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি—জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ সমস্ত সনাতন ধর্ম্মই এই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সাধনা। এই ব্রহ্মসাধনই হিন্দুর অপবর্গ—হিন্দুর ষষ্ঠীমাকাল পূজা হইতে অহংগ্রহোপাসনা পর্য্যন্ত সমস্তই এই ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান। এই ব্রহ্মছাড়া বস্তু নাই—ব্রহ্মছাড়া লীলা নাই, ব্রহ্মছাড়া খেলা নাই ? কে পূজা করে, কাহাকে পূজা করে, কি পূজা করে ?

সকলই ব্রহ্ম। এমন অদ্বৈতবাদ আর কোথাও নাই—এই আসল অদ্বৈত এক ঈশ্বরবাদ হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর ও জীবে তাহা দ্বৈত। এই ব্রহ্মসাগরে ব্রহ্মসলিল ভিন্ন আর কিছুই নাই—সকলই মায়া, সকলই অলীক, ভোজবাজি, স্বপ্নসঞ্চরণ—ব্রহ্ম সত্য আর সকলই মিথ্যা।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

যে জীব একবার এই ব্রহ্মসলিলে স্নান করে, সে উদ্ধার হয়—ত্রিসপ্তকোটী পুরুষ তাহার উদ্ধার হয়। এই ব্রহ্মের খেলা ভিন্ন জগতে কিছুই নাই—

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

তিনি এক—একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি; তিনি এক—আবার তিনিই বহু; ব্রহ্ম সমুদ্রে কত তরঙ্গ, সেই তরঙ্গে তরঙ্গে কত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর উঠিতেছে, পড়িতেছে, ভাসিতেছে ডুবিতেছে—কিন্তু সকলই এক।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা॥

এই পরা ব্রহ্ম সত্যসনাতন—মহাবিষ্ণু, ইনিই মহেশ্বর,—ইনিই মহাপ্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি মহাকালী। তিনি সৎ, তিনিই অসৎ, তিনি নিরাকার তিনিই সাকার, তিনি চেতন, তিনিই জড়। যিনি যাহাই করুন, সবই তিনি—পুতুলপূজা বলুন, গাছপূজা বলুন, ভূতপূজা বলুন—

আর নিরাকারের উপাসনা বলুন সকলই সেই ব্রহ্মসলিলে ব্রহ্মতর্পণ। এই জন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

ওলাবিবির ভজনা কর আর যে কোন শ্রেষ্ঠদেবের পূজা কর 'সর্ব্ব-দেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি'—সমস্তই সেই বিষ্ণুদেবেই গমন করে—ঋজুকুটীল পথে নানাগতিতে সমস্ত নদনদীই সেই মহার্ণব মহেশ্বরের চরণকমলে পড়িয়া ধন্য হয়। ব্রহ্ম যখন অব্যক্ত তখন এক ব্রহ্মের বহুরূপ—যখন অভিব্যক্ত। ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, অব্যয়, অক্ষর,—ইহাই সত্য। পুনশ্চ—ব্রহ্ম সকল গুণগণাকর, সরূপ, মঙ্গলময়, আনন্দময়, স্বপ্রকাশ। তিনি সর্ব্বশক্তি, সকল তাঁহাতে সম্ভব—তিনি নিয়মের মধ্যে, আবার তিনি নিয়মের অতীত, তিনি বিশ্বের মধ্যে, পুনশ্চ তিনি বিশ্বাতীত ও বিশ্বানুগ। সকলপ্রকার বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ তাঁহার মধ্যে দেখা যায়—ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাং পুনশ্চ অভয়ং অশোকং অক্ষরং তিনিই। তদ্ব্যতিরিক্ত জগতে আর দ্বিতীয় বস্তু নাই—

যচ্চ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যেন সর্ব্বমিদং ততম্

ব্রহ্মের যখন অব্যক্ত অবস্থা তখন কে তাঁহার সন্ধান পায়?—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

এই ব্রহ্মশক্তি মহেশ্বর ইনি স্বীয় মায়া বা প্রকৃতিবলে এই জগদাদি-চরাচর সৃষ্টি করেন।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।

মায়াধীশ প্রকৃতি সংযোগে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ড জলবুদ্বুদের ন্যায় উঠিয়া ফুটিয়া ফাটিয়া জলের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে। জীবসঙ্ঘের হাস্যরোদন কলহকোলাহল সুখদুঃখ মিশিয়া গিয়া কি অপূর্ব্ব ঘটনা প্রবাহের সৃষ্টি করিতেছে; আবার সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া মহানন্তে মিশিয়া যাইতেছে—কে করিতেছে, কেন করিতেছে, কি জন্য করিতেছে—আমরা কে, 'কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই'—What are we, where are we, actors or spectators' কিছুই ত বুঝিনা—এই জন্য দার্শনিকরা জগতের এই খেলা unknown ও unknowable বলিয়া agnostic বলিয়া গিয়াছেন—কেহ বা অনির্ব্বাচ্য বলিয়া, কেহ বা মায়া বলিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন; কেহ বা সেই ন্যাংটা মাগীর' আপ্তভাবে গুপ্তলীলা বলিয়া আনন্দবাজারে মজা লুটিতেছেন। ভাইরে জল জল করিয়া H_2O বিশ্লেষণ করিয়া কি হইবে, ছানাচিনির পরিমাণ লইয়া বচসা করিলে কি মনের ক্ষুধা মিটিবে? যদি মিটাইতে চাও, এই ব্রহ্মসলিলের বিন্দুপান কর—প্রাণ শীতল হইবে—বিশ্বাসে মিলয়ে হরি তর্কে বহু দূর। কে ইহাকে দেখিয়াছে? কে ইহাকে পাইয়াছে, শ্রুতির সেই বচনই কেবল মনে পড়ে।

মহেশ্বর মায়াধীশ পুরুষ সর্ব্বশক্তিময়ী প্রকৃতির সহিত লীলা করিবার জন্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। মূলে এক, পরে দুই হন,—তারপর সেই দুইএ মিলিয়া বহু হ'ন। ইনি এক—একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা—একমেবাদ্বিতীয়ম্। যখন ব্রহ্ম গুণযুক্ত, তখন তিনি ঈশ্বর। গুণযুক্ত হইয়া তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সাজিয়া সৃষ্টি, পালন ও প্রলয় করিয়া থাকেন।

এই সৃষ্টি স্থিতি লয়ে, এই উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিতে মহাছন্দের সৃষ্টি ইহাই জগতের ঋত—cosmic law—যখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না—"নাসদাসীন্ নোসদাসীৎ তদানীম্।" ঋক্।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

In the beginning, when there was no light every-thing was chaos—তখন এই out of notning out of ehaos আসিল cosmos ; এই cosmic law বৈদিক ভাষায় ঋত—ওঁ ঋতং চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত—এই ছন্দঃ cosmic law, ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি। সৃষ্টিমূল, ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, তিনি রক্ত—সৃষ্টির উদ্ভব রক্তে, বিষ্ণু রক্ষা করেন—ইনি পীত, আবার যিনি ধ্বংস করেন তিনি মহাকাল। মহাদেব প্রলয় তাণ্ডবে সকলই সংহার করেন। ইহাই ত্রিতত্ত্ব—ত্রয়ো দেবাঃ। একই ব্যক্তি; যখন যেরূপ কর্ম্ম—তখন তাহার সেইরূপ নাম হয়. যে কর্ত্তা, সেই ভোক্তা, সেই শ্রোতা সেই দ্রষ্টা। এই জন্যই বলা হইয়াছে—

"সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশায় মূর্ত্তিত্রয়মুপেয়ুষে।
ত্রয়ীভুবে ত্রিনেত্রায় ত্রিকোটীপতয়ে নমঃ॥"

কুম্ভকার গৃহে কতশত মৃন্ময় পদার্থ। সবই পরস্পর পৃথক্। কিন্তু যদি মাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় দেখা যায়, সবই মৃত্তিকা, মৃত্তিকা ছাড়া কিছু নাই। নাম ও রূপ কল্পনামাত্র। সেই প্রকার যদি এই বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত বিশ্বসংসারের কারণের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সবই এক, সবই ব্রহ্ম। এই জন্যই বলা হইয়াছে "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা।"

ওঁ

সত্যমেকং ব্রহ্ম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিশ্ব।

'একোঽহং বহু স্যাম্'—এক আমি বহু হইব। কবে কোনদিন 'কারণং কারণানাং' এর বহু হইবার সাধ হইয়াছিল; তিনি আপনাকে ফলে, ফুলে, গ্রহতারকায়, গগনে, পবনে, নদী-সাগরে, রূপে, রসে গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে, মাধুর্য্যে ফুটাইতে চাহিয়াছিলেন। একে ত' খেলা হয় না; চাই দুই, চাই বহু, তাই তিনি বহু। লীলায় তিনি সৃষ্টি করেন, লীলায় তিনি পালন করেন, লীলায় তিনি সংহার করেন। লীলার আদিও লীলা, মধ্যও লীলা, শেষও লীলা—এই লীলার মধ্যেই তাঁহার মাধুরী সম্ভোগ।

রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণে লাগে চমৎকার
আপনারে আপনি যে যান আলিঙ্গিতে।

সৃষ্টিতত্ত্বের মূলই ইচ্ছা, উহাই কাম, উহাই বাসনা। জগতে যে স্থলে যাহাকিছু সৃষ্টি, তাহারই মূলে ইচ্ছা। যাহার ইচ্ছা নাই বাসনা নাই, কামনা নাই, তাহার সৃষ্টি করিবারও কিছুই নাই। God said—Let there be light and there was light. এই said এর মধ্যে ভগবানের ইচ্ছা। কামস্তদ্ সমবর্ত্ততাগ্রে মনসঃ কামঃ প্রথমং রেতঃ আসীৎ—সৃষ্টির পূর্ব্বে কামই ছিলেন, এই কামই মনের প্রথম রেতঃ। সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টির ছবি ফুটিয়া উঠে—রাম না হইতেই রামায়ণ হওয়াই সৃষ্টির বৈচিত্র্য। সন্তান হইবার পূর্ব্বে মা যে তাহাকে ইচ্ছা দিয়া, মনের বাসনা কামনা দিয়া, তিলে তিলে

গড়িয়া তুলিয়া, তাহার নামকরণ পর্য্যন্ত করিয়া, কত না আদর করিয়া থাকেন। এই ত' সৃষ্টি—সৃষ্টির মূলে ব্রহ্মের সেই বহু হইবার কামনা। সেই যে মদনতত্ত্বের প্রথম উন্মেষ, আজও পর্য্যন্ত আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সেই কামশক্তির মধ্যে হ্লাদিনীশক্তির অস্তিত্ব রহিয়া গিয়াছে। সৃষ্টির মূলে—এই লীলা, এই রসানুভূতি, এই কাম ভিন্ন অন্য কিছুরই আবিষ্কার বড় কঠিন। এই জন্যই সকল রসের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম রস আদি রস। বিজ্ঞানের জ্ঞান এস্থলে পরাজিত! বিজ্ঞান কেবল এক অপ্রতিহত নিয়তির (chance) স্কন্ধে সকল দায়িত্ব চাপাইয়া নিশ্চিন্ত। এত আলো, এত রূপ, এত হাস্য, এত বেদনা, এত দুঃখ, এত সুখ, এত রস, এত আনন্দ—মহিমায় মহিমায় মহিমার অনন্ত মিলন, উপরে সুনীল অম্বর, নিম্নে সাগরাম্বরা কাননকুন্তলা ধরণী, অভ্রভেদী মহান্ পর্ব্বত, কত বিচিত্র বিহগ, কত জীব, কত মানব, কত ভাষা, কত সম্পদ্, সকলই এক অতর্কিত ঘটনার সমাবেশে ঘটিয়াছে। বিশ্বাস করিতে হয় কর—মন বলিতেছে সামান্য বিষয়ও কারণ ভিন্ন হয় না। কার্য্য কারণ ব্যতীত হয় না—এই কারণং কারণানাং ব্রহ্ম, ইনি মহাবিষ্ণু, ইনি ঈশ্বর, ইনি প্রকৃতি, ইনি Nature, ইনি Force—ইনি নিয়ন্তা—ইঁহার কেহ নিয়ামক নাই। এই সর্ব্বসত্তার সত্তা, সকল কারণের কারণ, সকলের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছেন—ইঁহার মধ্যে সকলই আছে—সূত্রে মণিগণা ইব, ইনি এক ইনি বহু—ইনি বিশ্বমূর্ত্তি—ইনিই বিরাট্। ইনিই স্বরাট্—ইনিই রূপে রূপে বহুরূপ হইয়াছেন—ইনিই 'একানেকসহস্রকধারিণি'—ঐকৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। ইনিই সেই হৈমবতী উমা যাঁহার শক্তির নিকট ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম, সূর্য্য ক্ষীণশক্তি—ইঁহার নিকট অগ্নিরও সামান্য তৃণদাহ করিবার শক্তি থাকে না।

একে অনেক, পুনশ্চ অনেকে এক ; ছিল এক হ'ল বহু, জগৎকার্য্যের কারণ এক। একই কারণস্রোতের বিক্ষুব্ধ ঊর্ম্মিমালা সহস্রের সৃষ্টি করিল। গুণবিক্ষোভে সৃষ্টির ক্রিয়া—মায়াধীশ মায়াবলে সৃষ্টির মূলপত্তন করিলেন। 'প্রলয়জলে *বটের পাতা, চিত্ত চমৎকার'—কলকল ছল ছল করিয়া কারণবারি বহিয়া চলিয়াছে, সেই কারণসাগরে পদ্মাসনে মহাবিষ্ণু শয়ান ; তাঁহার নাভিকমলে ব্রহ্মার উদ্ভব। এই ব্রহ্মা আদিকবি—কবয়িতা রচয়িতা ইতি কবিঃ—কত না ছন্দে কত না রসে আদি কবি লোকপিতামহ পদ্মযোনি জগৎকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন ! কি সুন্দর তাহার ছন্দ ! ছন্দে ফুল ফুটে, ছন্দে রবিশশী উঠে, ছন্দে ঋতুর পর ঋতু আসিয়া মাসবর্ষ কাটিয়া যায়। এই প্রজাপতি পদ্মযোনি—পদ্ম সৃষ্টির প্রতীক। প্রাতঃকালে যখন পূর্ব্বদিক নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠে—উদিতানুদিত রবির স্ফুটনোন্মুখ জ্যোতিঃ যখন রক্তচ্ছবিতে আকাশ রাঙ্গাইয়া দেয়—পদ্ম তখন আপনাকে ফুটাইয়া তোলে। গভীর তমের অন্তে রজোরাগের মধ্যে এই পদ্মযোনির সৃষ্টি। পরে এই রক্তরাগের ভাস্বরজ্যোতিঃ হিরন্ময় হইয়া উঠে—সূর্য্যের সপ্তাশ্বরথ ঘর্ঘররবে অগ্রসর হয়—সকলই আনন্দময়—সকলই বিকাশোন্মুখ ; তখন এই জগচ্ছন্দঃ রক্ষা করেন সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু। ইনি সত্ত্বপ্রধান—পালন ইঁহার কার্য্য। ইনি শিষ্টের রক্ষণ দুষ্টের দমন করেন ; কমলা ইঁহার পদসেবা করিতেছেন—ইনি লক্ষ্মী, ইনি শ্রী, ইনি স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্যপ্রাচুর্য্যের মূর্ত্তি। কমলার কৃপায় ধনে ধান্যে ধরণী ধন্যা হইতেছে। বিষ্ণু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী—ইনি সৃষ্টিরক্ষার জন্য পালন সংহার দুইই করিতেছেন সৃষ্টি ধ্বংস দুই লীলাই বিষ্ণুর মধ্যে আছে। একদিকে রজঃ, একদিকে তমঃ একদিকে স্থিতি অপর দিকে গতি—এই Static ও Dynamic force বিষ্ণুর রূপ—পোষণ ও ক্ষয় এই ত দেহের metabolic রূপ—

জগচ্ছরীরে এই সৃষ্টিধ্বংস প্রতিনিয়ত চলিতেছে। রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন, তমোগুণে ধ্বংস চলিতেছে, নিত্য সৃষ্টি ও নিত্য প্রলয়ের মধ্যে বিষ্ণু তাল সামলাইয়া যাইতেছেন—গতিস্থিতির মহাছন্দে বিষ্ণু রক্ষা করিতেছেন—কিন্তু সময় যখন আসে, তখন কিছুই ধরিয়া রাখা যায় না। তখন 'ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিমিমিতি ডমরুং বাদয়ন্ সূক্ষ্মনাদং' প্রলয়-তাণ্ডবে মহারুদ্র তাহার রুদ্রলীলা আরম্ভ করেন—তখন কতদিনের সৃষ্টি এক মুহূর্ত্তে ধ্বংসের পথে চলিয়া যায়। এই জগতের খেলা—আদি মধ্য অন্তে তিনটী ঘটনা—সৃষ্টি, পুষ্টি ও নাশ। সৃষ্টির মধ্যে নাশের বীজ এবং নাশের মধ্যে সৃষ্টির বীজ—দুইই যমজ, একসঙ্গে দুই জনেই চলে, তাহার আদিরূপ সৃষ্টি, অন্ত্যরূপ লয়—মধ্যরূপ পুষ্টি। এই সৃষ্টি ও লয়ের মধ্যে সংসারচক্র চলিয়াছে—চলিতেছে, 'সম্যক্‌রূপেণ সরতি ইতি সংসারঃ।—এই অনাদি সৃষ্টিচক্র এই ভাবে চলিতেছে—এই ভাবে চলিবে—একে অনেক, অনেক এক হয়, এই সৃষ্টির খেলা। পিতা সন্তানের মধ্যে আপনাকে রাখিয়া এই সংসার রঙ্গমঞ্চে বিদায় লয়। ব্রহ্মা গড়িতেছেন, বিষ্ণু রাখিতেছেন, রুদ্র ভাঙ্গিতেছেন—যখন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সব একসাৎ হইয়া যাইতেছে—প্রলয়ান্তে যখন জগৎ একার্ণবীকৃত হইতেছে, তখন মহাবিষ্ণু সেই প্রলয়পয়োধিজলে অনন্ত শেষশয়নে শয়ান হইয়া সুপ্তসৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন। ব্রহ্মা নাভিকমলে ধ্যানস্থ—পুনশ্চ শক্তির সঞ্চারে ধীরে ধীরে ইচ্ছাশক্তির উন্মেষ ঘটে—তমো ফুটিয়া ধীরে ধীরে আলোক ফুটে, সৃষ্টিকমল ফুটিয়া উঠে।

পুরাণে যে বস্তু নানা রঙ্গে ফেণাইয়া ফেণাইয়া উপাখ্যানে, রূপকে বর্ণনা করিয়াছেন, দার্শনিক সে স্থলে বুদ্ধি ও বোধির ব্যবহার করিয়া সংখ্যায় বা fromulaয় আনিয়া ফেলেন। বেদ বলিলেন—সৎও ছিল না অসৎও ছিল না—নহি রূপ নহি রেখা নহি ছিল বর্ন চিন্। মন্ত্র

বলিতেছেন "আসীদিদং তমোভূতং" পরে "মহভূতাদিবৃত্তৌজাঃ তমোনুদঃ" স্বয়ম্ভূ ভগবান্ অব্যক্তকে ব্যক্ত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি স্বীয় শরীর হইতে নানা প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে জল সৃষ্টিপূর্ব্বক তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। এই 'অপঃ' (আপো নারায়ণঃ স্বয়ং) জলকে কারণের প্রতীক বলা হয়। এই বীজ ব্রহ্ম অণ্ডে পরিণত হইল, তাহা হইতে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া 'ধ্যানাৎ' ধ্যানবলে তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া তাহা হইতে জগৎ সৃষ্টি করিলেন। বেদ বলিতেছেন ঋত সত্য ও তপস্যা হইতে 'রাত্র্যজায়ত ততো সমুদ্রোঽর্ণবঃ' তাহা হইতে পারম্পর্য্যক্রমে 'বিশ্বস্য ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথ স্বঃ।' সাংখ্য চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বে জগতের সমস্তা formulaয় বাঁধিলেন; এক কথায় প্রকৃতি হইতে মহান্, মহান্ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে দশটী তন্মাত্র, তাহা হইতে পঞ্চ স্থূলভূত, অহঙ্কার হইতেই দশটী ইন্দ্রিয় ও মন। ইহারাই গুণত্রয়বিভাবিত হইয়া বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সৃষ্টিচক্র অনাদি; পূর্ব্বকল্পের কর্ম্মফল লইয়া বর্ত্তমান কালের সৃষ্টি চলিল—

যথর্ত্তুলিঙ্গান্যৃতবঃ স্বয়মেবর্ত্তুপর্য্যয়ে।
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ॥ মনু ১।৩০

ঋতু আসিলে যেমন ঋতুর চিহ্ন আপনি দেখা দেয়, প্রাক্তনকর্ম্মফল দেহীদের সম্বন্ধে সেইরূপ আপনি আসিয়া জুটে। এই ভাবে শ্রীভগবান্ "মুখবাহূরুপাদতঃ" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সৃষ্টি করিলেন। প্রজা-সৃষ্টির মানসে তিনি প্রথমে দশজন মহর্ষি সপ্তমনু, দেব, মহর্ষি, যক্ষ, রক্ষঃ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, নাগ, গ্রহতারকা, পশু, পক্ষী, মৃগ, মনুষ্য,

কীট, পতঙ্গ, সর্প, উদ্ভিদাদি সকলই সৃষ্টি করিলেন। এই জীবসঙ্ঘ চারি ভাগে বিভক্ত—উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ। এইভাবে সৃষ্টিচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়া আবার তিনিই ইহা সংহার করেন।

যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি ॥ মনু ১।৫২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মবাদ।

কারণ ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে না—প্রত্যেক কর্ম্মের কারণ আছে। কোন বস্তুই জগতে অকারণক নহে, 'সর্ব্বং কর্ম্মবশং জগৎ'। কর্ম্মের গতি অতি গহন (কর্ম্মণো গহনা গতিঃ) ; তবে কোন কর্ম্মই নিরর্থক বা অহেতুক নয়। কর্ম্মধারা নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় চলিয়াছে ; কর্ম্মের পর কর্ম্ম, তাহার পর কর্ম্ম, তাহার পর কর্ম্ম ; এই ভাবে কর্ম্ম-চক্রের সহিত মানবের ভাগ্যচক্র নির্ম্মিত হইয়া চলিয়াছে। এই কর্ম্মচক্রের ক্রূর নিষ্পেষণে মানব মাকড়সার ন্যায় নিজ জালে নিজেই জড়ীভূত হয়, তখন আর তাহার গতি থাকে না ; সে তখন আপনাকে দৈবপীড়িত বলিয়া মনে করে। নচেৎ কেহ কাহারও ইষ্টানিষ্ট করিতে পারে না সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করে, "স্বকর্ম্মফলভুক পুমান্" ; "দোষ কার'ও কিছু নয়মা শ্যামা আমি স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরি"। সমস্ত সংসারচক্র এই কর্ম্মধারার অধীন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে সামান্য উদ্ভিদ্ কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলই কর্ম্মাধীন। কেবল বর্ত্তমান কর্ম্ম দেখিলে চলিবে না। বর্ত্তমান কর্ম্ম গতকর্ম্মের ফল এবং ভবিষ্যদ্ কর্ম্মের সূচক - ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান একসূত্রে গ্রথিত। এইভাবে জন্মজন্মান্তরের, যুগ যুগান্তরের, বংশপরম্পরায় কর্ম্মপুঞ্জ মানবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ব্যক্তিগত কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি, তাহার উপর সমগ্র জাতির (collective or racial কর্ম্মও আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং যুগধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছে। কোন

কর্ম্মের বিচার করিতে গেলে এইভাবে অনন্ত কর্ম্মধারা দৃষ্ট হইবে। এই কর্ম্মধারার আদ্যন্ত কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। 'কর্ম্মণো গহনা গতিঃ' আর বলি 'বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি নমস্তৎ কর্ম্মভ্যঃ'।

কর্ম্মবাদের মূলকথা—কোন কর্ম্ম কারণশূন্য নহে এবং প্রত্যেক কর্ম্মের ফল মানবকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মফল অখণ্ডনীয়। 'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি"—কর্ম্মফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। মানুষের সমগ্র জীবন কর্ম্মসমষ্টির ফল—মানুষের আগামী জীবনও কর্ম্মসমষ্টির পরিণাম। সুতরাং কর্ম্ম তিন প্রকার—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। যাহা পূর্ব্বে কৃত কিন্তু যে কর্ম্মের ফল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম। একটা লোক দৌড়াইতেছে, হঠাৎ তাহাকে থামিতে হইবে, কিন্তু থামার চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাকে কয় পা চলিতে হয়, এ কিছুতেই রোধ করা যায় না—এই যে দুর্নিবার গতি বা momentum ইহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম। ইহার ফল ভুগিতেই হইবে। হাতের তীর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—তীর লক্ষ্যাভিমুখে চলিয়াছে, এক্ষণে ইহাকে প্রতিসংহার করিবার উপায় নাই—ইহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম। এই প্রারব্ধ কর্ম্মের অনিবার্য্য ফল দেখিয়া কেহ কেহ ইহাকে অদৃষ্ট বলেন। অদৃষ্ট শব্দের নিরুক্তিগত অর্থ ন দৃষ্ট—যাহা কেহ কখন দেখে নাই। দেখা হয় নাই 'ন দৃষ্টম্' অতএব অদৃষ্ট। এই অদৃষ্ট কর্ম্মপুঞ্জের পরিণাম। কতকগুলি কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে—এগুলি হয়ত প্রতিক্রিয়া দ্বারা কতকটা ফলের পরিবর্ত্তন বা প্রতিরোধ সম্ভব হইতে পারে। আর কতকগুলি কর্ম্ম করিয়া যাইতেছে—ইহা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম; এসম্বন্ধে কোন কিছুই বলা যায় না। কর্ম্মানুরূপ ফল নিশ্চিতই ঘটিবে।

কর্ম্মের অনুষ্ঠান মাত্রেই ফল দেখা যায় না। বীজ বপন মাত্র শস্য

সম্ভব নহে—বীজ শস্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে স্থান, কাল ও পারি-পার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। দুষ্টান্ন ভোজনমাত্র কাহারও উদরাময় রোগ ঘটে না ; দুষ্টান্ন ভোজনে সকলের পীড়া হয় না ; দুষ্টান্ন ভোজনে ঋতুবিশেষে বিশেষতঃ পীড়া প্রায়ই ঘটে। সুতরাং কোন বস্তু বিচারে স্থান কাল পাত্রের কথা বিশেষ বিচারের প্রয়োজন। কোন্ কর্ম্মের কি ফল post-hoc-ergo, propter hoc—after this therefore this বা কাকতালীয় ন্যায়ে হয় না। কোন্ কর্ম্মে কি ফল ঘটিতেছে, তাহা বুঝা সহজ নহে। নানাকর্ম্মের সমাবেশে অদৃষ্টচক্র গড়িয়া উঠিতেছে—কিন্তু অদৃষ্টচক্র 'নসীব' বা কিসমৎ accident বা chance coincidence নহে। পরন্তু ইহা কার্য্যকারণ পরম্পরায় গ্রথিত—ইহার স্তরে স্তরে কারণশৃঙ্খলা বা causal nexus বর্ত্তমান। কর্ম্মকে কর্ম্মফল হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই—উভয়ই একবস্তুর অগ্রপশ্চাৎ মাত্র।

কর্ম্মের যে বাহ্যরূপ তাহা দেখিয়া মানুষের বিচার করা চলে না। কর্ম্মের মূলে বাসনা বা কাম এবং এই বাসনা বা কামনার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী অহংভাববিভাবিত মন। জগতে যাহা কিছু করা যায়, সকল কর্ম্মের মূল মন "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"। সংসার-চক্রটী চলিতেছে এই মনের আদেশে—মন যাহার বশীভূত সে ত্রিভুবন জয় করিয়াছে—আর যে মনের বশে, সে এই সংসারচক্রের পাকে পাকে ঘুরিয়া মরিতেছে। এই জন্যই সাধু মহারাজ বলেন—'মন্‌কা কহনা কভি নেহি করনা' মনের পথে যেওনা যেওনা—অমন সর্ব্বনাশী বস্তু জগতে নাই। এই মনের মায়ায় পড়িয়া "অনিষ্টমের ইষ্টমেব ভাতি ইষ্টমেব অনিষ্টমিব ভাতি অনাদিসংসারবিপরীতভ্রমাৎ." সংসারের সকল কাজের মূল মন ; কিন্তু আমরা মনকেও আঁখি ঠারি এবং ভাবের ঘরে চুরি

করি। নিত্যস্নায়ী নিরামিষাশী হইয়া ফোঁটাতিলক কাট, কুড়াজালি হাতে করিয়া নামকীর্ত্তনে নিমেষ হারাই না—কিন্তু মনের মাঝে যে পঙ্ক সেই পঙ্ক—যে বাসনা সেই বাসনা—সেই কামক্রোধলোভমোহের যে দাস সে দাস—কিছু থাকে ত' আছে অহং, আমি সাধু, আমি ব্রাহ্মণ আমি বৈষ্ণব, আমি পণ্ডিত, আমি গুরু—আমি, আমি, আমি। শাদা কাপড়ে সহজে ময়লা পড়ে বলিয়া বিশ্বের পাপ গৈরিকে চাপা দিই; কিন্তু ভিতরের পাপ যায় কিসে? বাহিরের কর্ম্মে ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম কর্ম্ম-সমষ্টি নহে - কর্ম্মসমষ্টির ফলেই অদৃষ্টচক্র নির্ম্মিত হয় না—কর্ম্মের মধ্যে যে ভাব, যে মন আছে, তাহা লইয়া অদৃষ্টচক্র নির্ম্মিত। এ কথা অবশ্য স্বীকৃত যে কর্ম্ম বহুস্থলে মনের বা ভাবের দ্যোতক কিন্তু দেখা যায় ধর্ম্মাদি অনুষ্ঠানে ইহা বহুস্থলে মনের ভাব গোপনের জন্য অনুষ্ঠিত। 'আমার ষোল আনা প্রাণ সংসারেতে টান্ মুখে শুধু ডাকি দয়াময়' এ হইলে ত চলিবে না। মনের ভিতর মানুষের চরিত্রের নিদর্শন—তাহার মর্ম্মচক্রের কলকাঠি।

এ সম্বন্ধে সন্ন্যাসী বেশ্যার গল্প উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এক সন্ন্যাসী বেশ্যার গৃহের সম্মুখে বাস করিত—বেশ্যাবাটীতে যত লোক প্রবেশ করিত সন্ন্যাসী তাহা লক্ষ্য করিয়া এক একখানি ইষ্টক রাখিয়া দিত; কিন্তু সন্ন্যাসীর মনটা বেশ্যার প্রতি আসক্ত ছিল। ইষ্টকে ইষ্টকে একটা পাহাড় হইয়া গেল অপরদিকে বেশ্যার মনের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, সে কেবল শ্রীভগবানকে ডাকে এবং কেবল জাতিব্যবসায় হিসাবে বেশ্যাবৃত্তি করে। পরে সে অত্যন্ত ঈশ্বরে ভক্তিমতী হইয়া শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিল। সেই সময়ে সন্ন্যাসীও দেহরক্ষা করিল। লোক মহাসমারোহে সন্ন্যাসীর সমাধি দিয়া তাহার উপর মঠনির্ম্মাণ করিল। অপরদিকে বেশ্যার দেহ কেহ দাহ

করিলনা—গৃহের মধ্যে তাহা পচিতে ধ্বসিতে লাগিল, চিলশকুনি তাহা ছিঁড়িয়া খাইল। পরলোকে কিন্তু বিচারটা অন্যরূপ হইল। বিচারের রায়ে দেখা গেল—বেশ্যার স্বর্গবাস ও সন্ন্যাসীর নরকনির্ব্বাসন। এ বিচার দেখিয়া ভোলানাথ গিরি মহারাজের গল্প মনে পড়ে—

আঁধিয়ার্ দেশ, আঁধিয়ার রাজা।
সের্‌ভর্ চূড়া, সের্‌ভর্ খাজা॥

চিঁড়ে খাজা এ হাটে একদরে বিকায়—মুড়িমিছরির বুঝি সমান দর। কিন্তু বিচারে গলদ নাই; বেশ্যার দেহ অপবিত্র, ফলে দেহের দুর্গতি, মন ঈশ্বরবশ—ফলে স্বর্গবাস। সাধু দেহ পবিত্র রাখিয়া দিল—ফলে চন্দনচর্চ্চিত দেহের পুষ্পসহ সমাধি; কামকলুষিত মন কেবল লোকলজ্জায় স্বকার্য্য সাধন করিতে পারে নাই—ফলে নিরয়নিবাস। অজামিল পাপপঙ্কিল চরিত্র লইয়া শেষে 'নারায়ণ' বলিয়া উদ্ধার পাইল কেন? কেন সে পুত্রের নাম 'নারায়ণ' রাখিল? কি উদ্দেশ্যে? অজামিল পূর্ব্বে কি ছিল? কেন তাহার পতন হইল তাহা জান কি? যদি সে কথা জানিতে তবে এই উপাখ্যান কেবল অর্থবাদবাক্য বলিয়া, প্ররোচক আখ্যান বলিয়া ছাড়িয়া দিতে না। মূল কথা কার্য্যের মধ্যে যে ভাবাত্মক মন, কর্ম্মচক্রের সেই সূত্র। মানুষকে আমরা এত দেখি, কিন্তু মানুষের চরিত্র বুঝিতে পারি না, কারণ আমরা বাহিরের কর্ম্মময় মানুষ দেখি, কিন্তু ভিতরের ভাবময় মানুস, দেখিনা—ভিতরের ভাবময় মানুষটী আসল মানুষ, বাহিরের মানুষটী সকল সময় চিনিতে পারা যায় না। কত বাহির ভাল লোক দেখা যায়, কিন্তু ভিতরটী তাহার যতদূর কালো হইতে হয়, আবার কত পাপীতাপী লোক, কিন্তু ভিতরটা এত সুন্দর যে তাহাদের পায়ের ধূলা ধরণী পবিত্র করিয়া দেয়। চরিত্র কেবল কর্ম্মের উপর নয়; ইহা কর্ম্মের উপর যে কর্ত্তৃত্ব করে, সেই

মনের যে চিরন্তন ভাব, তাহার উপর নির্ভর করে। ধর্ম্ম কেবল কর্ম্মের অনুষ্ঠান নহে, ধর্ম্ম মনের স্থায়ী অবস্থা। মনের যে ভাবময় রূপ, তাহাদ্বারা মানুষের অদৃষ্ট সূচিত হয়। শ্রুতি এই জন্য বলিতেছেন পুরুষ বাসনাময় (কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি); তাহার যেমন কাম সেইরূপ চিন্তা (স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি), চিন্তানুরূপ তাহার কর্ম্ম (যথাক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম্ম কুরুতে); যেমন কর্ম্ম সেইরূপ তাহার ফল (যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে)। এই ভাবে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মমূল চিন্তাদ্বারা মানব স্বীয় জন্ম, আয়ুঃ বিদ্যা, ধন, জ্ঞান, কলত্রাদি স্বজনবর্গের বিধান করিতে থাকে (অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষে যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যতদিন কর্ম্মবন্ধন, ততদিন সংসারচক্র, পরে মানব যখন এই কর্ম্মচক্র সাধনার বলে এড়াইতে পারে, তখনই তাহার মুক্তি। এই 'করমবিপাকে গতাগতি'—কর্ম্মশৃঙ্খল না খসিলে মুক্তি নাই—মুক্তি নাই। এই কর্ম্মের বিপাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—এই কর্ম্মের ফলে দেব মানব যক্ষরক্ষঃ, এই কর্ম্মের পরিণামে সুখ ও দুঃখ—

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ॥

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে
বিষ্ণুর্যেন দশাবতার গহনে ক্ষিপ্তো মহাসঙ্কটে
সূর্য্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে॥

কর্ম্মই যদি জগতে সর্ব্বেসর্ব্বা হইল তাহা হইলে আর দেবতার অস্তিত্ব কেন? কর্ম্মবাদ বা পুরুষকার ও দৈব লইয়া দার্শনিকদের মধ্যে বাদানুবাদ আছে। Law of Predestination বা Pre-

determination, Fate বা কিসমৎ লইয়া এদেশে তত মারামারি না থাকিলেও দুর্ব্বল মানব ভাগ্যের উপর দোষ চাপাইয়া খালাস হইতে পারিলেই বাঁচে। 'আমার যেমন কপাল, কপালে করাচ্ছে, আমি কি কি করি?'—এসকল কথায় কতকটা নিজ দায়িত্ব এড়ান যায়, মনের মধ্যে হয়ত একটু সান্ত্বনা পাওয়া যায়। কিন্তু এ জগতে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সহস্রচেষ্টায় মানব বিফলকাম হইয়া পড়িতেছে—যাহা ইচ্ছামাত্রেই সিদ্ধ হইত, শতচেষ্টায়ও তাহা হয় না, তখন মনে হয়, একি আমি কি করি? না অপর একজন মালিক এই সমস্তই করাইতেছেন।

অঘটিতং ঘটয়তি সুঘটিতঘটিতানি দুর্ঘটী কুরুতে।
বিধিরেব তানি ঘটয়তি যানি পুমান্নৈব চিন্তয়তি॥

মানুষ গরুর মত খোটায় বাঁধা—খানিকটা দড়িছাড়া আছে বলিয়াই মনে করে আমি খুব স্বাধীন; কিন্তু সে ত আদৌ স্বাধীন নয়—সবই তার বাঁধা। এসকল কথা শুনিতে বেশ, কিন্তু যুক্তিযুক্ত নয়—মানুষের ভাগ্য যতটা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে ত তাহার কর্ম্মচক্র হইতেই সৃষ্ট। তদ্ব্যতীত আর কি আছে? যদি অপরকর্ত্তৃক মানুষের ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তবে নীতি, ধর্ম্ম, স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই থাকে না। সকলই ভাগ্যের স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। যে চুরি করে, সে বলে, চৌর্য্যই যে আমার ভাগ্যলিপি, 'দোষ' ত' আমার নহে, আমার ভাগ্য। এসকল ভ্রান্তিজাল—মানুষই মানুষের কর্ম্মদ্বারা তাহার ভাগ্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

দেবতা বা দৈবের তবে সার্থকতা কি? আমরা যদি আমাদের কর্ম্মফলদ্বারা ভাগ্যচক্র সৃষ্টি করি, দেবতারা তবে কি করেন? গ্রীক Epicurean দের মত তাহা হইলে বলিতে হয়, "দেবতা থাকিতে

পারেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। "দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি" দেবতা দেয়, এ ত কাপুরুষের কথা। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"—ভাগ্যলক্ষ্মী পুরুষকারের বশ—"None but the brave deserves the fair"—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, যোগ যাগ আর আরাধনা এসবে কিছু হবে না।" ইহাই কি সত্য ?

দেবতার কথা যখন উঠিল তখন একবার হিন্দুর দেববাদ কি তাহা জানা প্রয়োজন। দেব বা দেবতা শব্দ দীপ্তি পাওয়া কথা হইতে আসিয়াছে; ইংরাজীতে মোক্ষমূলর ইহাকে The Shining ones বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। এই দেববৃন্দ উচ্চস্তরের জীববিশেষ—সত্বগুণ সম্পন্ন পুণ্যাত্মা উচ্চাবস্থাপ্রাপ্ত যোনিকে দেবযোনি বলা হয়। মানুষই কর্ম্মবলে দেবতা হয়—আবার ক্ষীণপুণ্যে মর্ত্ত্যলোকমাবিশন্তি। এই দেববৃন্দের একটী বিশেষ লক্ষণ—ইঁহারা পরোপকারী। মানবের হিত করা ইহাদের একটা বিশেষ স্বভাব—ইহাদের নিকট মানুষের সকল কল্যাণের বীজ নিহিত। এই দেবপর্য্যায়ে ঋষি ও পিতৃগণ আছেন। কোন কোন ঋষি মানবহিতার্থে ওষধিরূপে জীবের হিতসাধন করেন। পিতৃগণ জন্মকালীন জীবের সুক্ষেত্র জন্মবিধানের নিয়ামক হ'ন। এ সকল দেব নৈমিত্তিক দেব—পুণ্যনিমিত্ত দেবতা আর পুণ্যক্ষয়ে ইহারা উৎকৃষ্টস্তরের মানব হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ আর এক শ্রেণীর দেবতা আছেন—ইঁহারা উচ্চস্তরের—যেমন চন্দ্র ইনি ওষধ্যাধিপতি, সূর্য্য ইনি জগতের আত্মস্বরূপ মানবের রোগ নাশ করেন; ইন্দ্র বায়ু যম বরুণ ইঁহারা দিক্‌পালরূপে নানা দিক্ রক্ষা করেন। ইহার উপরের স্তর—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সৃষ্টি স্থিতি লয়—ইহা ত্রিদেবের কার্য্য। সর্ব্বোপরি—মহাবিষ্ণু বা মহেশ্বর—ইহার উপরের

কথা ব্রহ্ম—'বাচঃ যতো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। দেবগণ সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন—জীব নিজ কর্ম্মদ্বারা আপন ভাগ্য রচনা করিতেছে; কিন্তু জীব যে স্থলে দেবতার সাহায্য গ্রহণ করে, সে স্থলে ভাগ্যচক্র কতকটা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। দেবগণকে আকর্ষণ করিতে হয়—প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপে, প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক সংস্কারে, গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত ইঁহাদের সাহায্য লইতে হয়; তবেই কল্যাণ হয়। দেবতাকে যেরূপ ভালবাসিবে, দেবতাও সেইরূপ ভালবাসিবেন—দেহি মে দদামি তে—যেমন দিবে, তেমনই দিব। দেবতার সহিত সম্পর্ক রাখিয়া যজ্ঞের সৃষ্টি আর এই যজ্ঞ হইতে সৃষ্টিরক্ষা হইতেছে।

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।

আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

শ্রীভগবান্ গীতাতে যজ্ঞচক্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীভগবানের আশ্রয় লন, তাঁহাদেরই জয়, ক্ষেম, ভূতি লাভ ঘটে; যাঁহারা দৈবাশ্রিত তাঁহাদের শ্রী, আরোগ্য, আয়ু, সত্ত্ব; তাঁহাদেরই অশেষ কল্যাণ, স্বাস্থ্য ও সম্পদ্। ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ সকলই ঈশ্বরানুগতের করতলগত আমলকবৎ। প্রবল দৈব অতিদুরন্ত প্রারব্ধও নাশ করে—কিন্তু এ দৈবও অহেতুক নহে; ইহার মূল ঈশ্বর আরাধনা। এই দুঃখদৈন্য পাপতাপ রোগজরা পূর্ণ সংসারের শ্রীভগবানই একমাত্র সহায়। আমরা শিশুর ন্যায় অসহায়; যখন দুঃখে পড়ি, মাথার উপর ঝড় উঠে, তখন মা মা বলিয়া কাঁদিলেই মা রক্ষা করিবেন—

রোগান্ অশেষান্ অপহংসি তুষ্টা

দদাসি কামান্ সকলান্ অভীষ্টান্।

ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরানাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রযান্তি ॥
দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণী কা ত্বদন্যা।
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জন্মান্তরবাদ।

জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম সমস্যা অহংজ্ঞান। আমি কে? "আমি' 'আমি' করি, এ 'আমি' বস্তুটী কি? কোথা হইতে আসিলাম, কেনই বা আসিলাম, "কোথায় বা যাইব"—এই সকলই এক প্রশ্নের নানা শাখা। এই আত্মঅনাত্মবিবেক পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই আত্মতত্ত্ব লইয়া ঋষি, দার্শনিক, পণ্ডিত, সকলেই ব্যস্ত, কিন্তু এ তত্ত্বের সমাধান হইল না; যদি বা হইল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ন্যায় তাহাতে মানুষের বিশ্বাস জন্মিল না। শাস্ত্রকার ও দার্শনিক যাহা বলিয়াছেন তাহা যেন লোকে মানিয়াও মানে না বা না মানিয়াও মানে। ফল কথা সকলেরই এ বিষয়ে ধারণা অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ,—অথচ এ বিষয়ে সকলেরই কৌতূহল। ইহা জগতের একটী চিরন্তন প্রহেলিকা বা সনাতন সমস্যা। মরণের পরপারে The undiscovered country from whose bourne no traveller returns—সেই অন্ধকার অনির্দ্দেশ্যের মধ্যে কি আছে কে জানে?

জানা যায় কিনা জানি না; কিন্তু আমরা জানিতে চাই। যে গিয়াছে সে ত' ফিরিয়া আসে নাই; আর আসিলেই বা কে বিশ্বাস করিবে? এই কথায় বাইবেলের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে হয় "If they hear not Moses and the prophets neither will they be persuaded though one rose from the dead যাহারা মুনিঋষির কথা বিশ্বাস করিল না তাহারা কি প্রেতের কথায়

বিশ্বাস করিবে ? জানি না আমরা কোন্ ভরসা লইয়া সকল বস্তুই প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিতে চাই। আমাদের ক্ষমতা কতটুকু ?—আমাদের যে ক্ষমতা আছে, তাহা লইয়া দেখিই বা কতটুকু ? আমরা যাহা দেখি তাহা ত' অতি অল্প—'প্রত্যক্ষমল্পম্'—যাহা দেখি নাই তাহা যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমাদের যে অভিজ্ঞতা তাহা ত' দেশ কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; এই কারণে প্রত্যক্ষপ্রমাণই একমাত্র প্রমাণ নহে। প্রত্যক্ষের সঙ্গে যেমন অনুমান আছে, তেমনই শাব্দ প্রমাণ আছে। আমি কখন 'টর্পেডো', 'সাব্‌মেরিন' দেখি নাই—কিন্তু বিশ্বাস করি। যাঁহারা তাহার খবর রাখেন তাঁহারা তাহার সংবাদ দেন—তাহা শুনিয়া আমরা বিশ্বাস করি। এই সকল 'অচিন্ত্যভাব' বা তত্ত্বজগতের ধ্যান-গম্য গূঢ়রহস্যের যাহারা জ্ঞাতা, তাহাদিগের নিকট হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে—ইহাই আপ্তবাক্য। সাধনার প্রথম সোপানে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ব্যতীত জ্ঞানলাভ অসম্ভব। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"—আমি চতুর্থশ্রেণীতে পড়ি অথচ wireless বা বেতারের তত্ত্বকথা জানিতে চাহি—সোপানের পর সোপান উত্তীর্ণ হইয়া পদার্থবিজ্ঞানের বহু অংশ অধিগত করিতে পারিলে তবে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের জন্য ক্লেশ স্বীকার করিতে বা যে সংযম সাধনার প্রয়োজন তাহা স্বীকার না করিয়া সস্তায় যাহারা কিস্তিমাৎ করিতে চাহেন, তাঁহাদের কিরূপে শিক্ষা হইবে বুঝি না। ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইয়া-ছিল ; মানুষ ত' কোন ছার ! যদি সাঁতার শিখিতে হয় তবে জলে নামিতে হইবে—অধ্যাত্মবিদ্যা সংশয়দিগ্ধ চিত্ত লইয়া কেহ কখন লাভ করিতে পারে নাই—শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্বক আস্তিক্যবুদ্ধি

লইয়া যাহারা এ রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মুমুক্ষু ও জিজ্ঞাসু না হইলে তত্ত্বলাভ হয় না—জিজ্ঞাসু হইবার প্রয়োজন জিগীষা নহে; জিজ্ঞাসুর জয় হয়—জিগীযু পরিণামে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

আমি কে? এই ত' আমি—এমন সুন্দর রূপ, এই নধর দেহ, এই সুগঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এই যশঃ প্রতিপত্তি, এই ত' আমি! কৈ, এ আমি ত' নই, তবে এ রূপ ফুলের মত ঝরিয়া যায় কেন? কর্পূরের মত উপিয়া যায় কেন? এ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ বিবশ জরাজীর্ণ হয় কেন?—এই যশঃপ্রতিপত্তি এই থাকে এই যায় কেন?—যশ ত' আমি নই, রূপ ত' আমি নই, অঙ্গ ত' আমি নই। আমি যে অঙ্গকে চালাই, আমি যে রূপবান্, আমার যে যশঃ—তবে এর উপর আমি আমি আছি—এটা বড় আমি। দেহের উপর পরিচ্ছদের ন্যায়—এ দেহটা বুঝি আমার পরিচ্ছদ। আমি দেখি, আমি করি আমি বলি, আমি শুনি, আমার ঘর, আমার ছেলে, আমার বাড়ী—এই যে একটা 'কর্ত্তা' 'ভোক্তা' 'শ্রোতা' রহিয়াছে—এইটা আমি। এখন কর্ত্তাটা কে? এই দেহ ত' শুনে—এই চোখ দেখে, এই কাণ শুনে, এই রসনা আস্বাদ করে; এই ত্বক্ স্পর্শ করে—এই ত' আমি। ওরে না, না, এই যে অসুরের জল-পুরুষ দর্শনের ন্যায়; আমার চোখ ত' দেখে না, চোখ দিয়া দেখি, ত্বক দিয়া স্পর্শ করি, রসনায় স্বাদ লই। এই ইন্দ্রিয়গুলি সাধনমাত্র—instrument, যন্ত্র—এদের অধিপতি ভিতরে আছেন, তিনিই যে আমি; যদি চোখ দেখিত, মৃতের চক্ষু দেখিত, যদি কাণ শুনিত, এ শুনা বুঝি কখন বন্ধ হইত না—তাহা ত' নহে। মনস্তত্ত্বের মধ্য দিয়া দেখি—এ চোখ ত' টেলিফোঁর যন্ত্র—চোখে ছায়া পড়িল, অক্ষিতারার ভিতর দিয়া retinaয় গেল, retina হইতে optic nerveএর মধ্য

দিয়া সেরিব্রামের মধ্য দিয়া nerve-centre বা cortexএ চিত্রজ্ঞান হইল। কাহার জ্ঞান হইল, কে জ্ঞান পাইল, ধৃতিশক্তি সাহায্যে কে তাহা রক্ষা করিল—কাহার কর্তৃত্ববুদ্ধিতে এ সকল নিয়ন্ত্রিত হয়, বিজ্ঞান তাহার উত্তর দিতে পারে না। উহা কেবল এই রূপজ্ঞান (sensation of sight), ত্বাচজ্ঞান, শব্দজ্ঞানের পদ্ধতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া ক্ষান্ত ; কিন্তু এই শক্তির মূলকেন্দ্রের, এই নিয়ন্ত্রণক্ষম অন্তর্যামী পুরুষের সন্ধান দিতে পারে না।

কে করে ? কে বলে ? কে শুনে ? এ দেহ নহে, এ ইন্দ্রিয় নহে—ইহা তদ্ব্যতিরিক্ত, যাহার অস্তিত্বে ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা—যিনি না থাকিলে ইন্দ্রিও চলে না—সেই প্রাণনশক্তি, মননশক্তি, বিজ্ঞানশক্তি, আনন্দশক্তি, তিনিই আত্মা। তিনি আসিলে দেহ রূপসম্ভারে ভরিয়া উঠে, তিনি প্রস্থান করিলে দেহের জ্যোতিঃ টুটিয়া যায়—পচিয়া ধ্বসিয়া গলিয়া মাটীর দেহ মাটীতে মিশে। এই যে পরশপাথর কাদামাটীর এই দেহটাকে সোণার মত গড়িয়া তুলে, দেবতার মত শক্তিসম্পন্ন করাইয়া দেয়—যে না থাকিলে দেহের সত্তা থাকে না, যে চলিয়া গেল, ইহা অস্পৃশ্য শব—সেই ত' শিবময় আত্মা। যিনি আমার দেহের মন্দিরে অধিষ্ঠান করিতেছেন—যিনি আছেন বলিয়াই আমি আছি, তিনিই ত' আত্মা।

ওগো, আমি আছি, আমি আছি 'সোঽহমস্মি'—আমি না থাকিলে জগৎ থাকিত না। কে দেখিত চাঁদের হাসি, কে সূর্য্যের আলো উপভোগ করিত, ধনে ধান্যে রূপে রসে ভরা এই বিচিত্র জগৎ কে আজ অনুভব করিত, যদি আমি না থাকিতাম ? আমি না থাকিলে জগৎ নাই—আমি থাকিলে জগৎ আছে। আমি যদি সরিয়া যাই, বিশ্বজগৎ সরিয়া যায়। এই যে ফুলটী রূপে ঢলঢল, গন্ধে টলটল করিতেছে—

ওর অস্তিত্ব আমার জ্ঞানের উপর। আমি যদি ওকে না দেখি, আমি যদি ওকে ভোগ না করি—তবে ঐ ফুল নাই। এই জগৎটা আমার জ্ঞানের গোচরীভূত হইয়া আছে, নচেৎ নাই। জগতের মধ্যে আমি নই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলই আমার মধ্যে—সাধে কি তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল লইয়া গোল বাঁধিয়াছিল! আমার মধ্যে এই বিশাল জগৎ—এই আমিটুকু—এই জ্ঞানটুকু কেবল আবার ব্যক্তিস্বতন্ত্র জ্ঞান নহে (individual consciousness নহে); ইহা বিশ্ববিজ্ঞানের উপর (universal consciousness) প্রতিষ্ঠিত—এই বিশ্ববিরাট সার্ব্বজনীন যে জ্ঞান—সেই ত' সত্যই জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—সেই ত' বিরাট—সেই ত' বিশ্বব্যাপী—সেই ত' বিষ্ণু—'যেন সর্ব্বমিদং ততম্'।

আমি আছি, আমি আছি—আমি জানি যে আমি আছি, সেই জন্যই ত' আমি আছি, এ জ্ঞান যে হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে বোধ করি। Descartes এক কথায় আত্মতত্ত্বের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াছেন—cogito ergo sum,—যেহেতু আমি জানি সেই হেতু আমি আছি। এই সৃষ্টির মূলে অহং—'অহং'কে মুছিয়া ফেল—সৃষ্টি নাই। এই ক্ষুদ্র অহং মহদহংএ মিশাইয়া দিলে জলের বিম্ব যেমন জলে মিশাইয়া যায়, সকলই সেই ব্রহ্মসলিলে লয় হইবে।

এই যে আত্মা—ইনি ব্রহ্মের একটী কণামাত্র। যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ, যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ, যেমন তরঙ্গে জলকণা—এই জীব সেই ব্রহ্মের কণামাত্র।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

এই আত্মপুরুষ ব্রহ্মের কণা বলিয়া—ব্রহ্মের যে বৈশিষ্ট্য তাহা

ইহার মধ্যে আছে। যখন গুণ ও উপাধিবিশিষ্ট—তখন আত্মার বহু দুর্গতি, আর যখন ইনি মায়াপ্রপঞ্চ ভেদ করেন, তখন 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।' অতএব এই আত্মা অজ, শাশ্বত, নিত্য, পুরাণ, জরামৃত্যুহীন—মানব যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নববস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মা সেইরূপ জীর্ণদেহ ত্যাগপূর্ব্বক নবদেহ ধারণ করে মাত্র।

মরিলেই মানুষের মরণ হয় না। মরণে মাটীর দেহ—পঞ্চভূতের দেহ, পঞ্চভূতে মিশায়। আত্মা ত' দেহ নয়. কারণ জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় নাই, হইবে না ও হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি (abiogenesis) প্রমাণিত হয় নাই। যেখানে চৈতন্যের বিকাশ সেইখানেই চৈতন্য পূর্ব্বে নিহিত ছিল, নতুবা যাহাতে যাহা নাই, তাহা হইতে তাহার উদ্ভব হয় না—"নাসতঃ সঞ্জায়তে।" আমি জড় নহি—আমি যে চেতন, আমি জানি, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমার দেহ, এই "অহং" "মম" জ্ঞান আমি কিরূপে অস্বীকার করি। যেহেতু আমি জানি তাইত' আমি আছি—এ যে সকলের অপেক্ষা বড় প্রমাণ। জড়বাদী সমগ্র জগৎকে কাটিয়া ছাঁটিয়া অনুবীক্ষণে ফেলিয়া গণিয়া গণিয়া মাত্র atom বা পরমাণুবাদে গিয়া পৌছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান যে আজ সে সকল ছাড়াইয়া Ion, Electronএর ভিতর দিয়া এক মহাশক্তির সত্ত্বা স্বীকার করিতেছে—এই ত' মহাশক্তি—পরমা ঐশীশক্তি। এই আত্মাশক্তির খেলা—সৃষ্টি স্থিতি লয়; এ খেলা অনাদি, এই ত' সংসৃতি লীলা—কেবল সংসর্পণ, কেবল গতি—কেবল চলে, রূপে রূপে রূপান্তর হয়। এই শক্তি যে স্থলে প্রচ্ছন্ন সে স্থলে জড়, যে স্থলে প্রসুপ্ত, সে স্থলে উদ্ভিদ্, যে স্থলে ঈষৎ উদ্বুদ্ধ সে স্থলে অণ্ডজ ও জরায়ুজ—যে স্থলে পূর্ণ প্রকাশিত সে স্থলে মানব—আর যে স্থলে উৎকর্ষলাভ করে—তাহা দৈবীশক্তি। চৈতন্যের

দুই রূপ—কিন্তু মূলে শক্তি এক, kinetic energy বা potential energy, গতিশীল শক্তি বা স্থিতিশীল শক্তি, একই শক্তির দ্বিবিধ মূর্ত্তি—এই পরমাশক্তি এই মহামায়ার পরম বিভূতি অস্বীকার করিবার উপায় কি? আমরা এই মোহকলিল বুদ্ধিতে তাঁহাকে চিনিব কেমন করিয়া? সেই মহাশক্তির হস্তে আমরা ক্রীড়নক মাত্র। আত্মতত্ত্বের সার কিরূপে উদ্ঘাটন করি—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

চৌরাশিলক্ষযোনি ভ্রমণ করিয়া জীব মানবজন্ম গ্রহণ করে—"পেয়েছ মানব জনম, এমন জনম্ আর পাবে না"। কত যুগ যুগান্তরের অভিব্যক্তিতে এই মানবদেহ, সাধে কি সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "এমন মানবজমীন্ রইল পড়ে আবাদ কর্লে ফল্ত' সোণা"। যদি পাশ্চাত্য বিবর্ত্তনবাদীদিগের অনুসরণ করা যায়, দেখা যাইবে যে যুগ-যুগান্তরের মধ্য দিয়া এই মানবরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে। কবে কোন্ যুগে কোন্ সময়ে পশুবৎ মানব হইতে অসভ্য বর্ব্বর মানব, তাহা হইতে ক্রমশঃ সভ্যতার আবর্ত্তনে মানবের বর্ত্তমান রূপটী পাওয়া গিয়াছে। এই মানবের সৃষ্টির মধ্যে আমরা পাঁচটী স্তর বা কোষ দেখিতে পাই। প্রাক্‌সৃষ্টি কেবল অন্নময় কোষের বিকাশ—অন্নের উপাদান পঞ্চভূত; এই অন্নময় কোষের বিশেষ বিকাশ উদ্ভিদাদিতে দেখা যায়—বাহিরে ইহাদের সংজ্ঞা নাই, কিন্তু ভিতরে প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে:—অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ, ঋষির এই বাণী আজ স্যার্ জগদীশচন্দ্র প্রমাণিত করিয়াছেন। অন্নের পর প্রাণ—প্রাণের বিশেষ লক্ষণ গতি বা স্পন্দন, ইহা বিশেষভাবে ক্রিমিপ্রভৃতি

সেকল পদার্থে দেখা যায়। প্রাণময় কোষের অভিব্যক্তি এই সেকল জীবে। পশ্চাৎ মনোময় কোষ—মনন শক্তি যাহা প্রজনন বিশেষ দ্বারে বিহগাদি অণ্ডজ জীবে দেখা যায়। ইহার মধ্যে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় কোষ দেখা যায়। পরে জৈব স্থষ্টিতে জরায়ুজ স্থষ্টি—ইহার মধ্যে পঞ্চকোষই দৃষ্ট হয়। মানবে ইহার পূর্ণাভিব্যক্তি—মানবের জীবাত্মা পঞ্চভূতে বিনিশ্মিত—প্রথমে অন্নময়কোষ, সেটা ভৌতিক দেহ, পরে প্রাণময়কোষ—তাহা vitality বা জীবনীশক্তি, পরে মনোময় কোষ, পশ্চাৎ বিজ্ঞানময় এবং সর্ব্বশেষে আনন্দময় কোষ। এই পঞ্চকোষবিনিবেশিত জীবাত্মা গুণকর্ম্মানুসারে উপযুক্ত ক্ষেত্রে পিতৃবীজ অবলম্বনপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রারব্ধের ফলভোগ করে এবং কর্ম্মানুরূপ বলসঞ্চয়পূর্ব্বক একদেহ হইতে অন্যদেহ লাভ করিয়া সংসারচক্রে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করে। যখন ঈশ্বরানুগ্রহে স্বীয় সাধনায় কর্ম্মপাশ ছিন্ন হয় তখন সেই জননমরণসংস্থতি হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করে। নচেৎ 'যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।' ইহাই মানবের নিয়তি। 'করমবিপাকে গতাগতি পুনঃ'—ইহার আর উপায় কি? এই কর্ম্মবন্ধনছেদন সনাতনধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।

মানবজীবনে একটী বিষয় বিশেষভাবে স্থির—তাহা মৃত্যু। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ" "জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা ভবে? চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন নদে?"—মানুষকে যাইতে হইবে। বড় হও, ছোট হও, ধনী হও, দরিদ্র হও, পণ্ডিত হও, মূর্খ হও, ব্রাহ্মণ হও, সকলকেই যাইতে হয়—The paths of glory lead but to the grave.

ভাল, মানুষ যায়—কিন্তু যায় কোথায়? বল্ দেখি ভাই, কি হয় ম'লে? সাধক রামপ্রসাদ শুধু ঘটটী ভাঙ্গিয়া গেল—আকাশ মহাকাশে

ফিনাইল বলিয়া [illegible] ইহুদ ([illegible]) ছাড়িয়া দিয়াছেন। [illegible] সমাধান হয় নাই—এবং 'ভূত' হয় বলে সকলে; একথাটায় কিছু অর্থ বুঝিতে পারা যায়। যে চলিয়া যায়—অতীতে পড়িয়া যায়, সেই ত ভূত; আর যে প্রকৃষ্টরূপে ইত বা গত সেই প্রেত। মানুষের দেহটা ত' তাহার বস্ত্র—সে পড়িয়া রহিল; কিন্তু আসল মানুষটা ত' মরে না। দেহের মধ্যে যে আত্মা, তাহা শাশ্বত ও অমর। এই আত্মার অমরত্বা যাহারা জানে না—পরকাল স্বীকার করে না, তাহারা দেহাত্মবাদী জড়বাদী, নাস্তিক। ইহারা সকল ধর্ম্মের বহির্ভূত। হিন্দু বল, বৌদ্ধ বল, খ্রীষ্টান বল, মুসলমান বল, সকলেই পরকাল স্বীকার করেন। মরণের পর এই আত্মার মৃত্যু হয় না—সে লোকান্তর গমন করে। ফলকথা আত্মা স্বর্গে যাউক, মর্ত্ত্যে আসুক বা নরকে যাউক—মৃত্যুর পর আত্মার সত্তা নাশ হয় না; সে অন্যত্র থাকে। কিন্তু দেহত্যাগের পর তাহাকে একটী সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিতে হয়। আর্য্যশাস্ত্রে তাহার সূক্ষ্মদেহ, লিঙ্গদেহ, আতিবাহিক দেহ বলা হয়—ইহাকে theosophistরা astral body বলেন। এই সূক্ষ্মদেহ দ্বারা ধরণীর কাজ চলে না—পুনশ্চ তাহাকে দেহান্তর ধারণপূর্ব্বক জীবলীলার আসরে নামিতে হয়—জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয়। যেমন কর্ম্ম, তেমন জন্ম হয়—মানবের কর্ম্ম পাপপুণ্যসংমিশ্র; স্বর্গে পুণ্যফল, নরকে পাপফল এবং তাহার পর কর্ম্মানুগ যোনিপ্রাপ্ত জীব সংসারচক্রে ভ্রমণ করে। সংসার-চক্র বলিতে স্বর্গ, মর্ত্ত, নরক এই তিনটী বুঝায়। স্বর্গে গেলেও মর্ত্ত্যে আসিতে হয়, 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি'। স্বর্গবাস মানবের পুণ্যফলে ঘটে। নরকে গেলে অনন্ত কালের জন্য নরকনিবাস করিতে হয় না; তাহা যদি হইত মানবের ন্যায় হতভাগ্য ও জঘন্য জন্ম আর থাকিত না। মানুষ যত পাপী বা নারকী হউক না কেন, সে ত'

স্বর্ণকণা—পুনশ্চ মাজিয়া ঘষিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করা যায়। স্বর্ণ অমেধ্যস্থানে পতিত হইলে অগ্নিশুদ্ধ করিলে আবার স্বর্ণ হইবে। মানুষও পাকা সোণা—কর্ম্মপুঞ্জ দগ্ধ ও গলিত হইলে মানব পুনশ্চ সেই কষিত কাঞ্চন হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জন্মিলেই মানুষকে মরিতে হয় এবং মরিলেই পুনশ্চ জন্মিতে হয়। কোন কোন ধর্ম্মে কেবল লোকান্তর প্রাপ্তির কথা আছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে লোকান্তরের কথা ত' আছেই, তাহার পর ইহলোকে পুনশ্চ জন্মপ্রাপ্তির কথা নিবদ্ধ হইয়াছে।

মানুষ যে ইহলোকে আসে, তাহার প্রমাণ কি? আমাদের পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি কোথায়? এস্থলে স্মর্ত্তব্য স্মৃতি ত' আত্মার কার্য্য নয়—কাজেই স্মৃতিরও লোপ ঘটে। তবে কাহারও কাহারও চিন্তাশক্তিসমূহ অতি দৃঢ়ভাবে সূক্ষ্ম মনের উপর লেপ রাখিয়া যায়—তাহাই বাসনা বা সংস্কার। এই সংস্কার পরজন্মে মানবের সহিত জন্মে বলিয়া তাহা সহজসংস্কাররূপে পরিণত হয়। এই সংস্কারপ্রভাবে কোন মানব অধিক চিন্তাশীল, মেধাবী বা অধ্যয়নরত হয়; কোন লোক বা গীতবাদ্য প্রভৃতিতে সহজনৈপুণ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে। জগতের বহুবৈষম্যের মূলে এই সহজসংস্কারের প্রেরণা বর্ত্তমান। পূর্ব্বজন্মের বৃত্তি, বিদ্যা বা প্রবল বাসনা পরজন্মে বহুস্থলে মানবের অনুসরণ করে—

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনম্।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা পত্নী অগ্রে ধাবতি ধাবতি॥

এই জন্য দেখা যায় দার্শনিক মরিয়া পুনশ্চ দার্শনিক, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক পুনশ্চ সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক হয়, তবে বংশধারা (heredity), আবেষ্টন (environment) ও শিক্ষার (culture)

দ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ভাবের বহু পরিবর্ত্তন ঘটে। কাহারও কাহারও স্মৃতি জন্মান্তরেও স্পষ্ট থাকে—সাধারণতঃ যোগী বা সাধকেরই ইহা ঘটে। শাস্ত্রে ভরতরাজার জাতিস্মরত্ব সুবিদিত। অনেক সময়ে স্বপ্নে বা মনের বিপ্রকৃত অবস্থায় পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি উঠিয়া পড়ে। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মপ্রমাণে স্মৃতির অভাব প্রধান প্রমাণ মনে করেন, তাঁহারা বলুন জীবনের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে পূর্ব্বস্মৃতি কতটুকু বর্ত্তমান? পুনশ্চ শৈশবের স্মৃতি কি পরবর্ত্তী জীবনে বিদ্যমান থাকে? জীবনে আমরা কতিপয় অতি স্থূল ঘটনাই মনে রাখি। অতি ছোট কথা—কাল বা পরশ্ব কি খাইয়াছি. আজ তাহার কিছুই মনে নাই। আরও দেখা যায় যে কখন কখন অতি কঠোর রোগে বা কোন দৈব দুর্ঘটনায় বা মানসিক বিকারে পূর্ব্বকালের স্মৃতি কখনবা সময়বিশেষের জন্য কখনবা সম্পূর্ণতঃ বিলুপ্ত হয়। অতএব পূর্ব্বজন্মপ্রমাণে স্মৃতির যুক্তি বিশেষ বলবতী নহে।

জন্মান্তর সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা জগতের মধ্যে বৈষম্য। এই বৈষম্যের মূল কারণ কি? জগতের মধ্যে কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ দুষ্ট, কেহ রোগী, কেহ ধনীর সন্তান, কেহ বিদ্বান্, কেহ রূপবান্, কেহ মূর্খ, কেহ জড়, কেহ বা প্রতিভাবান্—এই বৈষম্যের কারণ কি? শাস্ত্র বলিতেছেন—স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত সকলেই এই কর্ম্মচক্রের বশ। জন্মান্তরবাদের দ্বারা জগৎতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নৈতিক বিধি (moral order) সমর্থিত না হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই থাকে না। সুকর্ম্ম বা কুকর্ম্মের ফল আছেই—ইহাই হইতেছে বিধির বিধান। সুকর্ম্ম বা পুণ্যের ফল শ্রীবৃদ্ধি ও কুকর্ম্মের ফল দুঃখ—ইহাই নৈতিক বিধি (moral)—ইহা অলঙ্ঘ্য।

[illegible]গুলিতে বিধির বিধানে অবিচারের প্রমাণ না পাওয়া গেলেও পরিণামে, 'যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'—ইহাই ন্যায়। এই কারণে মানবের কর্ম্মানুযায়ী জীবের নানারূপ ভোগ ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্রে যে নানা পুণ্যকর্ম্মের প্ররোচনাবাক্য দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল প্ররোচক বাক্য নহে। তাহাতে যে নানাপ্রকার সৌভাগ্যাদি সংসূচিত হয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জগতে যে অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ বিকৃতিবুদ্ধি, জড়মতি, কুষ্ঠী, যক্ষ্মারোগীর প্রাদুর্ভাব, তাহার মূল কারণ মানবের পাপপ্রবৃত্তির অতিবৃদ্ধি। ঈশ্বরের কোন পক্ষপাত নাই যে তিনি কোন জীবকে জন্মদুঃখী করিবেন এবং কাহাকে চিরসুখী করিবেন। কেহ কেহ বলেন, মানবের মঙ্গলের জন্য তিনি কাহাকে অন্ধ বা খঞ্জ করিয়াছেন; যদি তাহাই হইল, তবে জগতে এত অমঙ্গল কেন? অতি দুষ্ট দস্যু ত' অন্ধ নহে বরং ভাল লোককে ভুগিতে দেখা যায়। এই অতি স্বল্প বর্ত্তমান জীবন ধরিয়া বিচার করিলে ত' চলিবে না। জন্মজন্মান্তরে কর্ম্মদ্বারা ইহজীবনের বিচার করিতে হইবে। যদি মানব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিবে তবে আর ঈশ্বরের প্রয়োজন কি? নমস্তৎ কর্ম্মভ্যঃ বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি। শুধু বিধানে হয়না—বিধানের নিয়ামক চাই—আইনজারি করিতে হইলে হাকিম পুলিশ চাই—এই সব আইনের উপরের আইন বিধির বিধান; তথায় ফাঁকী চলে না—ইহাই moral order, আর এই বিধির বিধান কর্ম্মানুরূপ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের নির্দ্দেশ করাইয়া সংসারচক্র চালাইয়া চলিয়াছে।

মরিলেই কি শেষ হয়? এই সংসারে আমরা যে তীব্র বাসনা কামনা বা রাগদ্বেষ লইয়া ছুটাছুটী করিতেছি তাহার কি একটা শেষ মীমাংসা নাই? এই বাসনার প্রাবল্য বা জীবনের সমগ্র কামনার [illegible] আমাদিগের ভবিষ্যৎ জন্মের কারণ হইয়া উঠে। অন্তঃকরণে

[illegible] সেই ভাবেই তাহার আগামী জন্মের দেহ বিনির্ম্মিত হয়। রাজর্ষি ভরত মৃগশিশুর প্রতি অনুকম্পাবশতঃ মৃগমোহযুক্ত হইয়া অন্তে মৃগচিন্তায় পরিণামে মৃগযোনি লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে কামনার প্রাবল্যে পিতা দেহান্তে পুত্রের পুত্রত্ব স্বীকার করেন। এইরূপ রাগদ্বেষে পরিচালিত মানব জন্ম-জন্মান্তরে শত্রুমিত্র হইয়া সংসারলীলা করিয়া যাইতেছে। যিনি জ্ঞান-সাধক, আজীবন জ্ঞানার্জ্জনে স্বীয় শক্তি নিয়োগ করিতেছেন, তিনি পুনশ্চ জন্মান্তরে দেহগ্রহণপূর্ব্বক এই জ্ঞানসাধনার তপস্যায় নিযুক্ত থাকিবেন ইহাই তাঁহার কামনা। এই বাসনার তীব্রতায় জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক তিনি জ্ঞানসাধনার পথে জন্মজন্মান্তর চলিয়া থাকেন। এই ভাবে যোগী বা সাধক বা প্রবল রাগদ্বেষসম্পন্ন ব্যক্তির জন্মপরিগ্রহ হয়। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে মৃত্যুকালে যে ভাব প্রবল হয় তদনুযায়ী মানবের জন্ম ঘটিয়া থাকে। এমন অনেক লোক দেখা গিয়াছে আজীবন পাপ করিয়া মৃত্যুকালে অতি পবিত্রভাবে সজ্ঞানে নামস্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিল। ইহার যে কর্ম্মরাশি, তাহার ফল অবশ্যই ভুগিতে হইবে। কিন্তু মৃত্যুকালে মানবের মনে যে ভাব ফুটিয়া উঠে তাহা তাহার জীবনের মৌলিকভাব বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। আজীবন পাপ করিয়া শেষ জীবনে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম আচরণের ফলে জীবনে সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটে মাত্র; কিন্তু অন্তঃকালে আজীবনের ভাব ও আচরিত কর্ম্মের চিত্রাবলী মনের পটে ফুটিয়া উঠে; ফলে নিজ কর্ম্মানুযায়ী জন্ম ঘটিয়া থাকে। অপর দিকে বুঝিতে হইবে কেবল বাহিরের কর্ম্মদ্বারা মানবের মনের ধর্ম্ম বুঝা যায় না। চিত্তের অবস্থা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ জন্ম ঘটিয়া থাকে। ভিতর যদি পরিষ্কার না হয়, চিত্ত যদি শুদ্ধ না থাকে, বাহিরে ধর্ম্মধ্বজা উড়াইলে

অন্তর্যামী তুষ্ট হইবেন না—ফলে মানবকে স্বীয় কর্মফল ভুগিতেই হইবে। কর্মফলে জন্মের ব্যবস্থা সত্য বটে, কিন্তু কর্মের কর্তা মন এবং এই মনের গঠনের উপর জন্মান্তরের সকলই নির্ভর করিতেছে। কারণ—'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ'।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুক্তি।

জীবনের পর মরণ ও মরণের পর জীবন ইহাই সংসার-লীলা। জীবের এই সংসারলীলা বাসনাকামনাদিগ্ধ হইয়া দুঃখময় হইয়া উঠিয়াছে। মললুলিতবপুঃ শিশু হইতে ইন্দ্রিয়শক্তিহীন জরাজর্জ্জর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই ত্রিতাপগ্রস্ত ও রোগশোকের অধীন; মুক্ত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ জীব দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দুঃখের সাগরে নিমগ্ন থাকে। জীবনের সান্দ্র অন্ধকারের মধ্যে যখন এক মুহূর্ত্তের বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় জ্ঞানালোকের সঞ্চার হয় কিংবা ভগবৎকৃপার সঞ্চার হয়, তখন মানবের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। পিঞ্জরাবদ্ধ প্রাণ-পক্ষী তখন কনককিরণোদ্ভাসিত অনন্ত আকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। স্বস্থ জীবের মনে তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে—এই দুঃখ হইতে কি মুক্তি নাই? ঋষি, দার্শনিক, কবি ও চিন্তাশীল মনীষিবর্গ যুগযুগান্তর হইতে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন মানবকে এই মুক্তির পথে নিয়ত অগ্রসর করিতেছে। জপ, তপঃ, যোগ, আরাধনা সকলেই এই মুক্তিপথের সহায়। বন্ধনক্লিষ্ট জীব মুক্তির আস্বাদের জন্য কত না সাধন ভজনের অনুষ্ঠান করিতেছে।

জীব ব্রহ্মেরই অংশ—ব্রহ্মসিন্ধুর বিন্দুমাত্র, সেই চিৎসূর্য্য বৈভবের কিরণমাত্র। বদ্ধজীব মায়ামলিন, ত্রিতাপদগ্ধ, পাপকলুষিত, পদে পদে পরতন্ত্র—আর মুক্তজীব নিত্য, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ শান্ত, শিব, শাশ্বত। সুতরাং অষ্টপাশের বজ্রবন্ধনে বদ্ধ হইয়া জীব মুক্তির জন্য আকুল

হয়। জীব ব্রহ্মের অংশ—জীব পুনশ্চ ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া গেলেই তাহার দুঃখমুক্তি ঘটে।

হিন্দুর সমস্ত সাধনারই এক লক্ষ্য—মুক্তি, এবং হিন্দুর মুক্তির ধারণাও সেই ব্রহ্মবস্তু লাভ। "সোঽহং সাধনা", তত্ত্বমসি সাধনার সকলেরই উদ্দেশ্য স্বরূপে অবস্থান। মুক্তিতত্ত্ব আলোচনায় দেখা যায় যে এই জগৎ দুঃখময়—মৃত্যু, জরা, ব্যাধি মানবজীবনের স্বাভাবিক পরিণাম। মানুষ দৈহিক ও মানসিকরূপ আধ্যাত্মিক দুঃখে সর্ব্বদাই প্রপীড়িত; ইহার উপর অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূকম্প, ঘূর্ণাবর্ত্ত বায়ু প্রভৃতি নানা উৎপীড়ন ও অত্যাচাররূপ প্রাকৃতিক দুঃখ আছে। আমাদের কর্ম্মফলের পরিণামে এই দৈব বা আধিদৈবিক দুঃখ। দুঃখের পর দুঃখ, তাহার পর দুঃখ—অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় দুঃখধারা ভিন্ন জীবনে সুখ নাই—আমরা যেটুকু সুখ দেখি তাহাও দুঃখকে তীব্রতর করিবার জন্য রহিয়াছে। এই সংসৃতি—এই জননমরণদোলার ভীষণ ঘূর্ণীপাক—রোগ, শোক, মোহ, মনস্তাপ, ইহাই আমাদের নিয়তি। অর্থাগমে দারিদ্র্যের, ঔষধসেবনে রোগের, আহারে ক্ষুধার, প্রিয়সমাগমে বিরহের শান্তি পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা ত' চিরস্থায়ী নহে। সম্পদ্ শরদভ্রচঞ্চল, যৌবন ক্ষণস্থায়ী, জীবন পদ্মপত্রে জলের ন্যায় চপল, অবচ্ছিদ্রযুক্ত দেহে স্বাস্থ্য ক্ষণভঙ্গুর, সৌহার্দ্দ জলসজ্ঘাতে নলিনীর ন্যায় মুহূর্ত্তে নষ্ট হইতে পারে; অভয়ের বাণী কোথায়? পবনোদ্ধৃত ধূলিকণার ন্যায়, স্রোতোনীত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়, সান্ধ্যঅন্ধকারবিতাড়িত বিহগসজ্যের ন্যায় আমরা আজ একত্রিত হইয়াছি। কিন্তু মুহূর্ত্তে এই সংসারের চাঁদের হাটবাজার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অস্তিত্বলেশহীন হইয়া যায়। অর্থ, যশঃ, বল, প্রতিপত্তি, রূপ, যৌবন, বংশমর্য্যাদা, কালের কবলে সকলকেই পড়িতে হইবে। এই প্রবল কালের প্রলয়ঘনঘোর গর্জ্জনের নিকট

[illegible] বিজয়গৌরবমুখরিত জয়যাত্রা বা সীজারের [illegible] বিজয়-বাহিনীর জয়দৃপ্ত কোলাহল বা নেপোলিয়নের বিশ্ববিপ্লাবী সর্ব্বসংহারিণী সৈন্যচালনা, বা উইলহেলমকৈসারের অঘটনঘটনপটীয়ান্ সৈন্যসমাবেশ, দূরস্থিত রথনির্ঘোষের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিমাত্র। এ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে—সকলই সর্ব্বভুক কালের বশীভূত। আমরা যাহাকে সুখ বলি, তাহা সুখের লেশাভাষও নহে। এই দুঃখজাল হইতে মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য শাস্ত্রাদির অবতারণা—ঋষিসঙ্ঘ মানবের ত্রিতাপ দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিসে নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয় ঘটে, কিসে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, কিসে পরমৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি ঘটে, সেই কল্যাণময়ী বাণী—সেই অভয়ের কথায় ভারতের সাধনা সমুজ্জ্বল হইয়া আছে।

মুক্তি কি? এই রোগশোকদুঃখদারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারে, এই ত্রিতাপ-তপ্ত, ভীত, আর্ত্ত, দলিত, মথিত প্রাণে শান্তি, সুখ, আনন্দ, অভয়প্রাপ্তি মুক্তি। কে পাইয়াছে—কে জানিয়াছে—কে সংবাদ দিবে? এ যে মূকের আস্বাদনের ন্যায়। কি সে সুখ, কি সে আনন্দ, কে বলিতে পারে? এই দুঃখ আর আসিবে না—একেবারে তাহার নাশ ঘটিবে, আত্যন্তিক বিলয় ঘটিবে। ঘট ভাঙ্গিয়া যাইবে, ঘটাকাশ মহাকাশে মিশিবে, সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্রে মিলাইবে—নির্ব্বাণং পরমং সুখম্—জীব শিব হইবে, তখন নামরূপ থাকিবে না—ভেদাভেদ ঘুচিয়া যাইবে, ত্বং অহং এ বাদ বিসংবাদ লোপ পাইবে; যাহা থাকিবে তাহা সচ্চিদানন্দ-রূপ 'শিবোঽহম্, শিবোঽহম্'। সংসারের বিকাশের মূল 'অহং'; এই 'অহং' বড় 'অহং'এ ডুবিয়া যাইবে—তখন 'মুক্তি', তখন 'সুখ', তখন 'আনন্দ'।

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" এই

সাধনায় নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নিতান্ত নির্ম্মলান্তঃকরণ, সাধনাচতুষ্টয় সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই—"জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ", "তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"।

এই মুক্তিসম্বন্ধে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এক নহে। ব্রহ্মনির্ব্বাণও ভক্তিযোগীর কাম্য হয় নাই। সাধক রামপ্রসাদ—ব্রহ্মনির্ব্বাণকে গালি পাড়িয়া বলিয়াছেন "চিনি হ'তে চাই না আমি চিনি খেতে ভালবাসি"। বৈষ্ণব মহাজনের নিকট মুক্তি পিশাচী মাত্র। বৌদ্ধনির্ব্বাণ ও হিন্দু নির্ব্বাণ প্রায় এক বলিয়া আচার্য্য শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া গালি খাইয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। হিন্দুর নির্ব্বাণ—'নির্ব্বাণং পরমং সুখম্"। "রসো বৈ সঃ, রসং লব্ধ্বা হেবায়মানন্দীভবতি" ইত্যাদি। নির্ব্বাণে দুঃখের নাশের কথা বড় কথা ; কারণ—

"অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ"।

এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নাশই 'মুক্তি'। প্রকৃতির বশীভূত হইয়া পুরুষের এই দুর্গতি—মহামায়া আজ বানরের নাচ নাচাইতেছেন। সেই প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্নতাই মুক্তি "তদ্বাচ্ছত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ ॥" সাংখ্যমতে ইহাই মুক্তি। বেদান্তমতে ব্রহ্মাদ্বৈতই মুক্তি। ন্যায়বৈশেষিক মতে পদার্থের যথার্থজ্ঞানে মিথ্যা জ্ঞান নাশে জন্ম ও দুঃখাভাবে মানবের মুক্তি। জৈমিনিমতে যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাপবর্গই মুক্তি—এ সংসার দুঃখের আগার, যজ্ঞাদি কর্ম্মে দেবতার প্রসাদলাভ করিলে মানব স্বর্গে বিবিধ সুখলাভ করে। তাহাই নিঃশ্রেয়স তাহাই মানবের চরমকাম্য। পতঞ্জলি সাংখ্যের মুক্তিই স্বীকার করেন। অবিদ্যার নাশে প্রকৃতিপুরুষের বিয়োগ ঘটলে মানবের কৈবল্য হয়। এই ষড়্দর্শনের যে কৈবল্যমুক্তি তাহা ভিন্ন স্মার্ত্ত পৌরাণিকগণ আরও নানা প্রকার মুক্তির কল্পনা করিয়াছেন। উপাস্য ও উপাসকের অভেদ কল্পন

মহাপাপ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ভক্ত ভগবানের নিত্য দাস—দাসের প্রভুর সহিত ঐক্য, ইহা কল্পনা করিলেও পাপ হয়। শ্রীভগবান্ মানবের প্রভু, গতি, শরণ—ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ, সর্ব্বশক্তি, অশেষগুণগুণাকর পরম 'ঈশ্বর'। জীব শ্রীভগবানের দাস্যসাম্রাজ্যে দাসরূপে অবস্থিত থাকিতে চাহে—তাঁহার সেবায় আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করে। সেই কারণে স্মার্ত্ত ও পৌরাণিকগণ সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সাযুজ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির প্রার্থনা করেন। ভগবৎ লোক প্রাপ্তিই সালোক্য মুক্তি। এই হিসাবে বৈষ্ণব বৈকুণ্ঠ, শাক্তশৈব কৈলাস, সৌর সূর্য্যলোক, গাণপত্য গণপতিলোক প্রার্থনা করেন। এই লোকে বাস করিয়াও কেহ তৃপ্ত হন না; তাঁহারা শ্রীভগবানের সন্নিধানে থাকেন—সনক সনন্দাদি মহর্ষিগণ সদৈব বিষ্ণুসমীপে বাস করেন। শ্রীভগবানের পরমাত্মীয় ভক্তবৃন্দ তদীয় রূপ প্রাপ্ত হন। যিনি যে দেবতার উপাসনা করেন, তিনি তদীয় বেশভূষা ধারণ করেন। বিষ্ণু ভক্ত চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ ধারণ করেন। শৈব শিবত্ব প্রাপ্ত হন—দেবতার অনুরূপ ঐশ্বর্য্য হয়—ইহাই সার্ষ্টি মুক্তি। দেবতার সহিত মিশিয়া যাওয়া—তাঁহার সহিত এক হওয়া সাযুজ্য মুক্তি। এইরূপ শাস্ত্রে নানা মুক্তির উল্লেখ থাকিলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা কৈবল্যমুক্তি জীবের চরম শ্রেয়ঃ ও প্রেয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চাতুর্ব্বর্ণ্য।

সনাতনধর্ম্মে বর্ণাশ্রমকে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে স্থান দেওয়া হইয়াছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সনাতনধর্ম্ম সমার্থবোধক; বর্ণাশ্রম ব্যতীত সনাতনধর্ম্মের ধারণা করিতে পারা যায় না। সনাতন ধর্ম্ম হইতে বর্ণাশ্রম উঠাইয়া দিলে তাহা আর সনাতন ধর্ম্ম থাকিবে না; অন্য কোন ধর্ম্মে পরিণত হইবে। প্রাণ ও দেহ লইয়া যেমন জীব—সেই প্রকার শ্রীভগবান্ ও বর্ণাশ্রম লইয়া সনাতন ধর্ম্ম। আমরা সাধারণতঃ মানবের ভিতরকার দিক্ দেখিতে পাই না, বাহিরের প্রকাশ বা বিকাশ দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে ধারণা করিয়া থাকি। সনাতন ধর্ম্মের ভিতরের সন্ধান পাওয়া বড় কঠিন; কেন না এই ধর্ম্মের তাত্ত্বিক ভাগ অতি উদার ও বিস্তৃত— কিন্তু বহিরঙ্গরূপ অত্যন্ত কঠোর ও অলঙ্ঘ্য। সনাতন ধর্ম্মে প্রায় সকল ভাবের লোকের ও সকল প্রকার মনের অবস্থার উপযোগী সাধনার বিধান রহিয়াছে; এই সাধনাক্ষেত্র যতদূর সম্ভব প্রশস্ত ও উদার। কিন্তু ইহার যে বহিরঙ্গরূপ বা সমাজসংস্থান তাহা অতি কঠোর। হিন্দুধর্ম্ম সমাজসমাবেশে ইহার যে লক্ষ্য ও সাধনা তাহার পুষ্টি ও সিদ্ধির বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছে। অন্য দেশে সমাজের সহিত ধর্ম্মের বিশেষ সম্পর্ক নাই। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য যে ইহার সমাজ-ব্যবস্থা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। একজন খ্রীষ্টান্ যে কোন জাতীয় ও যে কোন ভাবের রীতিনীতির পক্ষপাতী হইতে পারে—সমাজজীবনের সহিত তাহার ধর্ম্মজীবনের যোগ নাই; কিন্তু হিন্দুর পক্ষে সামাজিক

ব্যবস্থা ধর্ম্মব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে! অতিবর্ণী ও অত্যাশ্রমীদের কথা ছাড়িয়া দিলে সনাতন ধর্ম্মে সকলের পক্ষে সামাজিক নিয়ম ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। এজন্য আমাদের দেশে সমাজব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ মাত্রই ধর্ম্মের উপর আঘাত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

সনাতন ধর্ম্মের প্রধান কথা যে জীব নানা দুঃখে অভিতপ্ত হইয়া মুক্তির কামনায় অধীর; মুক্তি বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা স্বরূপে অবস্থান ইহাই সনাতন ধর্ম্মের লক্ষ্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ইহার চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া হিন্দুসমাজ-বিন্যাস ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জড় হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পতঙ্গের মধ্য দিয়া দেবতা পর্য্যন্ত সকলেরই লক্ষ্য মুক্তি। জড়া প্রকৃতি বা নিম্নগ অবস্থা হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরম চৈতন্যপ্রাপ্তি বা ঊর্দ্ধগ অবস্থায় স্থিতি ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। জড় হইতে ঈষদুদ্ভিন্ন-চৈতন্য উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ অণ্ডজ বা জরায়ুজ প্রাণী হইতে সূক্ষ্মদেহাত্মক দেবতাদি পর্য্যন্ত সকলেই ঊর্দ্ধগতির চেষ্টা করিতেছে। বাসনা ও কামনায় বদ্ধ হইয়া কেহ কেহ মধ্যে পড়িয়া যায় এবং পতনের পরে আবার উঠে—এই উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া তাহার যে গতি, শাস্ত্রে তাহাকে পিপীলিকার গতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কাহারও বা সাধনা অতি তীব্র; তাঁহার অধিক অপেক্ষা করিতে হয় না; তিনি একেবারে মোক্ষফল ধরিয়া ফেলেন—ইহা শুকের ন্যায় একেবারেই উড়িয়া গন্তব্যস্থান প্রাপ্তির ন্যায় বলিয়া শুকের গতি নামে খ্যাত হইয়াছে। মোক্ষফল প্রাপ্তির জন্য একজন পিপীলিকার ন্যায় অগ্রসর হইতেছে, অপরটী শুকের ন্যায় উড়িয়া চলিতেছে।

সংসারে জীবের গতি নিরুদ্দেশ নহে; মায়াবশে জীবের বামদেব-

গতি ('বামদেবঃ পিপীলিকা') ঘটিতেছে মাত্র। জীব নানা যোনির মধ্য দিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধগতিতে চলিতেছে এবং সকল গতির মধ্যে মানব-জন্ম শ্রেষ্ঠ ; মানবজন্মে বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণস্বরূপ ভারতে জন্ম বহু পুণ্যের দ্যোতক এবং এই ভারতে আর্য্যসন্তান হওয়া আরও পুণ্যফলের দ্যোতক। আর্য্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞের মধ্যে আচারবান্ এবং আচারবানের মধ্যে জ্ঞানী এবং জ্ঞানীর মধ্যে ভক্ত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং উর্দ্ধগতিতে ক্রমে সকলকেই ব্রাহ্মণ হইতে হইবে—এবং ব্রহ্মণ্য ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর অনুশীলন, ব্রহ্মণ্যরক্ষা এবং ব্রাহ্মণভক্তি হিন্দু-ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। ব্রহ্মণ্য নষ্ট হইলে ধর্ম্মও নষ্ট হইবে—এই ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষের মূল ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। এই ব্রহ্মণ্যগুণ যাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান তিনি ব্রাহ্মণ না হইলেও সংস্কারব্রাহ্মণ এবং এই ব্রহ্মণ্যসংস্কারদ্বারা পরজন্মে জাতি ও সংস্কার লইয়া পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ হইবেন, ইহাই হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণ হইবার ব্যবস্থা ; নচেৎ কেবল সূত্র-ধারণ দ্বারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না।

যুগধর্ম্মে ব্রহ্মণ্যের পতন হইয়াছে বলিয়া ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রেরও পতন হইয়াছে ও কর্ম্মসাঙ্কর্য্য আসিয়াছে এবং কলির পণ্টনরা বর্ণসঙ্কর আনিবার চেষ্টায় বেশ দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন। ব্রাহ্মণরা দম্ভবশে নিজের অধঃপতন আনিতেছেন ; আর সমগ্র সমাজে ব্রাহ্মণবিদ্বেষের প্রাবল্য ফুটিয়া উঠিতেছে। মূলকথা ব্রাহ্মণই বা কে, শূদ্রই বা কে এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যই বা কে ? সাধনার স্তরে এগুলি আত্মার এক একটী অবস্থা মাত্র। আজ যে ব্রাহ্মণ কাল সে শূদ্র, আজ যে শূদ্র কাল সে ব্রাহ্মণ—মূল লক্ষ্য ক্রমবিকাশসূত্রে আত্মার উর্দ্ধগ গতি।

আত্মার মধ্যে যখন সত্ত্বগুণের প্রাবল্য, রজস্তম স্তিমিত তখন

ব্রাহ্মণের উদ্ভব। পুনশ্চ আত্মা যখন রজঃপ্রধান সত্ত্বে অধিষ্ঠিত তমোগুণ সুপ্ত, তখন ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব। আত্মায় যখন রজস্তম সাম্যভাবে স্থিত, তম ঈষদুদ্ভিন্ন তখন বৈশ্যাবস্থা এবং শূদ্রে তমের প্রাবল্য, সত্ত্বরজঃ স্তিমিত। বর্ণভেদের বিচারে এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমের বিচার করিতে হয়। কেন না চাতুর্ব্বর্ণ্য 'গুণকর্ম্মবিভাগশঃ' সৃষ্ট হইয়াছে। সত্ত্ব (শ্বেত) প্রকাশক—জ্ঞানশক্তির সহায়, রজঃ (রক্ত) চাঞ্চল্য কর্ম্মশক্তির প্রণোদক, তমঃ (কৃষ্ণ)—আবরক, কর্ম্মরাহিত্য আলস্য, জাড্য বা ধ্বংসের উপাদান। রজোদ্বারা ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, সত্ত্ব দ্বারা বিষ্ণু পালন করেন, তামসী শক্তি দ্বারা রুদ্র ধ্বংস করেন। সত্ত্বের দ্বারা ব্রাহ্মণ শাস্ত্রব্যবস্থা স্থাপনপূর্ব্বক সমাজ সুস্থিত করেন, রজোদ্বারা ক্ষত্রিয় সমাজরক্ষা করেন, রজস্তম সংমিশ্রণে বৈশ্য সমাজে লক্ষ্মীশ্রী আনয়ন করেন, অজ্ঞান ও আবরক শক্তি দ্বারা শূদ্র সমাজে নিদ্রা, জড়তা, অজ্ঞান ও অহঙ্কারে সমাজে প্রলয় আনয়ন করেন কিন্তু উচ্চ বর্ণত্রয়ের অধীন থাকিয়া শূদ্র সমাজশরীরের সেবা করেন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যেমন প্রাকৃতিক লীলা ইহা সেইরূপ সামাজিক নিয়ম বটে। সৃষ্টির প্রথম যুগে ব্রহ্মণ্যের প্রাধান্য, তখন সত্ত্বের প্রাবল্য—তখন ব্রাহ্মণ, ঋষি, ধর্ম্মযাজক প্রধান; পরে ক্ষত্রিয়যুগ—তখন নৃপদিগের প্রাধান্য, ইহা মধ্যযুগ—এখন knight ও chivalryর প্রতিপত্তি; পরে দেখি বৈশ্যযুগ, তখন ভীমার্জ্জুন সম যোদ্ধা আর নাই; তখন শ্রেষ্ঠী, বৈশ্য, বণিক বিরাট অর্ণবপোত লইয়া দিকে দিকে বাণিজ্য করিতেছে; সর্ব্বত্র merchant princeদের প্রাবল্য। পরে গণের যুগ; Labour versus Capitalএর যুদ্ধ—For workers alone বলিয়া বলশেভীদল বলের সেবা করিতেছেন। এই গণ বা শূদ্রজাগরণে তামসিক যুগের সূচনা—ইহাই প্রবল কলি। কালের প্রলয় বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে—তমের প্রাবল্যে সকলেই বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইবে,

ইহাই এ যুগের সূচনা—পশ্চাৎ প্রবল কলির প্রাবল্যে প্রলয়ের দ্বাদশ সূর্য্য জ্বলিয়া উঠিবে—ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ।

হিন্দুসমাজে জাতিভেদ সমাজে বিপ্লব আনিবার জন্য নহে, পরন্তু সমাজে শৃঙ্খলা সংরক্ষণার্থ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সনাতন আর্য্যসমাজ বিরাট্ পুরুষের দেহস্বরূপ; ব্রাহ্মণ ইহার মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র চরণস্বরূপ,—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

অতএব দেখা যাইতেছে সনাতনধর্ম্মে এই জাতিভেদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সমাজ-অঙ্গের (body politic) এক একটী অবয়ব মাত্র। ইহার মধ্যে উচ্চ নীচ বলিয়া যে ভেদাভেদ করা হয়, তাহাই দূষ্য। অঙ্গের কোন স্থলে আঘাত লাগিলে সর্ব্বত্র লাগাই জীবনের পরিচয়। 'উদর ও অবয়বের কলহ' সর্ব্বনাশের মূল স্বরূপ—জাতিভেদ স্বাভাবিক কিন্তু জাতিবৈর সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও আত্মদ্রোহ মাত্র।

জাতিভেদ প্রায় সকল সভ্যসমাজে ছিল বা আছে এবং থাকিবে কিন্তু ভারতে বর্ণভেদের এই বৈশিষ্ট্য যে ইহা ধনসম্পত্তি বা প্রতিপত্তির প্রাধান্য না দিয়া শুদ্ধসত্ত্বের প্রাধান্য দিয়া বর্ণভেদ জন্মগত করিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণের জ্ঞান ও তপোবলের নিকট নৃপতির মণিমুকুটালঙ্কৃত মস্তক অবনত। সম্মানের মানদণ্ডে অর্থসম্পত্তির স্থান কিছুই নহে—ভারতে ধর্ম্মপরায়ণ ভিক্ষুক অধার্ম্মিক নৃপতি অপেক্ষাও ভক্তি এবং সম্মানের পাত্র। জাতির সম্মান মানুষের সম্মান নহে ইহা সর্ব্বতোভাবে গুণের সম্মান। যেহেতু—

সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেতবিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥

ব্রাহ্মণ বিষের ন্যায় সম্মানকে ত্যাগ করিবেন এবং অপমান অমৃতের ন্যায় গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদৃষ্টিতে "প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ আশ্বচণ্ডাল-গোখরম্"। সকল দেশেই জাতিভেদ অর্থের উপর সংস্থিত (pluto-cratic), কিন্তু ভারতে অর্থকে অনর্থ বলিয়া দূরে ত্যাগপূর্ব্বক সাত্বিক গুণাবলীর সম্মান করিয়াছেন। ইহাতে দেশ হইতে হিংসাদ্বেষ অসূয়া দূরীভূত হইয়াছে এবং গুণের সমাদর হওয়ায় সমাজবিপ্লব নিরস্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মণ্যের লক্ষণ গীতায় সুস্পষ্টভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানবিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

অপরদিকে—

শৌর্চং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

পুনশ্চ বৃত্তির দিক দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়ন মেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥

পশূণাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন মেব চ
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥

মনু ১।৮৮—৯১

সুতরাং ব্রাহ্মণের (১) অধ্যয়ন, (২) অধ্যাপন, (৩) যজন, (৪) যাজন, (৫) দান ও (৬) প্রতিগ্রহ।

ক্ষত্রিয়ের (১) প্রজারক্ষা, (২) দান, (৩) ইজ্যা, (৪) অধ্যয়ন ও (৫) বিষয়ে অপ্রসক্তি।

বৈশ্যের (১) পশুপালন, (২) দান, (৩) ইজ্যা, (৪) অধ্যয়ন, (৫) বাণিজ্য, (৬) কুসীদ ও (৭) কৃষি।

শূদ্রের (১) অসূয়ার সহিত ত্রিবর্ণের সেবা।

প্রত্যেক সমাজেই দেখা যায় যে, পণ্ডিত জ্ঞানী বা চিন্তাশীল ব্যক্তি সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন; ইঁহারা প্রধানতঃ (১) যাজকসম্প্রদায় (২) শিক্ষকসম্প্রদায় (৩) ব্যবস্থাপক সম্প্রদায় (৪ দার্শনিক, কবি গ্রন্থকার ইত্যাদি—ইঁহারাই তৎ তৎ সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান অধিকার করিয়া আছেন। অপর দিকে শাসনকর্ত্তা, রাজপুরুষবৃন্দ, যুদ্ধবিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ, সৈন্য ও পুলিশবিভাগীয় ব্যক্তি—ইহারা ক্ষত্রিয়। তৃতীয়তঃ বণিগ্‌বৃন্দ ও কৃষকসম্প্রদায়, চতুর্থতঃ—শ্রমিকদল। সুতরাং সর্ব্বসমাজেই এই চারি বর্ণের সমাবেশ দেখা যায়। অন্যত্র ইহা কর্ম্মগত, কিন্তু ভারতে ইহা জন্মগত ও কর্ম্মগত। কিন্তু ইহাও দ্রষ্টব্য ভারতের জাতিবিভাগ কেবল বৃত্তি লইয়াই কল্পিত হয় নাই—বৃত্তির সহিত কয়েকটী কর্ত্তব্য ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরিস্থ বর্ণত্রয়ের মধ্যে—

অধ্যয়ন যজন ও দান সাধারণ বৃত্তি। অপরদিকে গীতায় ব্রাহ্মণাদির বর্ণনায় যে সকল গুণের বর্ণনা হইয়াছে, তাহাতে কেবল বাহিরের বৃত্তিভেদে বর্ণভেদ কল্পিত হয় নাই—বরং এই বর্ণভেদ অভ্যন্তরীণ বৃত্তি-ভেদে কল্পিত হইয়াছে।

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥

এই বৃত্ত হইল আচার। আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ—এই আচার না থাকিলে বেদপাঠ ও ব্রহ্মণ্য আনিতে পারে না। কেবল বেদপাঠে যদি ব্রাহ্মণ হইত তবে মাক্সমূলার্, মাক্‌ডোনেল্, কাউয়েল্, ওয়েবার্, উইণ্টারনিট্‌জ্ সকলেই ব্রাহ্মণ হইতেন। যে অবস্থায় আত্মার ব্রহ্মণ্য-গুণ পূর্ণ প্রকটিত হয় তাহাই ব্রাহ্মণের অবস্থা। এই অবস্থা কর্ম্মতন্ত্রের উপর নির্ভর করে এবং কর্ম্মচক্র জন্মতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

অধুনাতন প্রথায় শিক্ষিত হিন্দুসংস্কারবিরোধী সমালোচকবর্গ বর্ণাশ্রমবিচারে প্রধানতঃ একটী মারাত্মক ভ্রম করিয়া বসেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট 'জন্ম' দৈবপ্রসূত মাত্র—ইহার কোন 'কারণ' বা 'হেতু' নাই। এই যে জন্ম accident বা chance মাত্র—ইহা হিন্দুধর্ম্ম মানে না। কর্ম্মানুসারে জন্ম, ইহা হিন্দুর নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য (সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ)। জন্ম যদি কর্ম্মগত হয় তবে এইরূপ বর্ণবৈষম্যে কাহারও কোন ক্ষোভের কারণ নাই ; যাহার যেরূপ কর্ম্ম সে সেই অবস্থায় আছে এবং কর্ম্মের উন্নতির সহিত অবস্থার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

এই ভাবে জন্ম কর্ম্মগত হওয়ায় সমাজে ঈর্ষ্যাদ্বেষ প্রভৃতি সম্পূর্ণতঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। অপরত্র, আমরা দেখিতে পাই যে, ধনিদরিদ্রে, প্রভুভৃত্যে, রাজাপ্রজায়, শ্রমিকধনিকে ভীষণ দ্বন্দ্ব, ঈর্ষ্যা, ঘৃণা বর্ত্তমান।

এদেশে জন্ম কর্ম্মগত হওয়ায় এবং শ্রেণীর বিভাগ গুণগত হওয়ায় এবং তাহা সত্ত্বাদি গুণের উপর বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নিম্নস্থিত বর্ণ উচ্চবর্ণকে ভক্তিশ্রদ্ধার চক্ষুতে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। শম, দম, তপস্যা স্বার্থশূন্যতা, সারল্য, সত্য, আর্জব, বিদ্যানুশীলন, সদাচার প্রভৃতি দেখিলে মন যে স্বভাবতঃই নত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণকে কি দেখিয়া হিংসা করিবে? দারিদ্র্যই তাহার জন্মগত অধিকার—দারিদ্র্যের ভাগীদার কেহই হইতে চাহে না। ব্রাহ্মণ দেশের সকল সুখ সুবিধার অধিকার একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে, একথা বলা সম্পূর্ণ ভুল, বরং ব্রাহ্মণ সকল সুখ সুবিধা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়' আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে। এইরূপ না হইলে আজও সেই ব্রাহ্মণবংশধরগণ পতিত, স্খলিত ও ভ্রষ্ট হইয়া সম্মানের অধিকারী হইত না। লোকে পূজ্যের সম্মান করে, অপূজ্যের নহে। পুরাকালের ত্যাগ, সংযম ও আস্তিক্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণের সম্মানেই এখনও ব্রাহ্মণ পূজিত হইতেছেন।

আমরা আজ এই বর্ণাশ্রমের অতি মহান্ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়াছি বলিয়া আদর্শ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারি না। বরং এই আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আমাদের অবশ্য করণীয় কর্ম্ম।

প্রাচীন ভারতের বৈশিষ্ট্য এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, ইহার সংরক্ষণে আমাদের জাতীয়তার স্থিতি—ইহার নাশে জাতির ধ্বংস। সনাতনধর্ম্মই আমাদের পরমগৌরব এবং এই গৌরবোজ্জ্বল মুকুটের মধ্যমণি বর্ণাশ্রম—ইহার সংরক্ষণ আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায়, সমাজের সুব্যবস্থায় ত্যাগের গৌরবে, দীনের সেবায়, জীবের সংরক্ষণে ও এক কথায় জ্ঞান কর্ম্ম ও সেবায় দেশের ও দশের জীবন উন্নত ও মহিমোজ্জ্বল করাই বর্ণাশ্রমের লক্ষ্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চতুরাশ্রম।

চারি বর্ণের ন্যায় চারিটী আশ্রম হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের বিশেষ অঙ্গ। উপরিস্থিত বর্ণত্রয়ের জীবন চারিটী বিভাগে বিভক্ত—প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয়ে গার্হস্থ্য, তৃতীয়ে বানপ্রস্থ ও চতুর্থে সন্ন্যাস বা ভিক্ষুত্ব। কলিযুগে মানব ক্ষীণপ্রাণ হওয়ায় চতুর্থাশ্রম নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে—এই কঠোর আশ্রমব্রত পালন করা দূরে থাক্, তাহার কল্পনাও এক্ষণে অসম্ভব। হিন্দুজীবনের একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য যে তাহার প্রতিকর্ম্মই ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত। সামান্য শৌচ, আহার বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্যান, ধারণা, পূজা, জপ, তপঃসাধনা প্রভৃতি সকলই ধর্ম্মাঙ্গ ও বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। জীবনকে সাফল্য ও সিদ্ধির দিকে লইয়া যাইতে হইলে যে সংযম ও সাধনার প্রয়োজন, এই চতুরাশ্রমে প্রধানতঃ তাহাই বিহিত হইয়াছে। সাধনা ভিন্ন কোন বিষয়েই সিদ্ধি লাভ ঘটে না। জীবনের চরম লক্ষ্য নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি। এই পরম কল্যাণের জন্য যে সংযম ও তপস্যার প্রয়োজন তাহার ব্যক্ত মূর্ত্তি চতুরাশ্রম।

চতুরাশ্রমের প্রথমটী ব্রহ্মচর্য্য—জীবনসৌধের ইহাই ভিত্তি। ভিত্তি সুদৃঢ় ও প্রশস্ত না হইলে যেমন গৃহ সুদৃঢ় ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না; সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যে সুব্যবস্থিত না হইলে জীবনও সুগঠিত হয় না। এই এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই জীবনগঠনের প্রথম সুব্যবস্থা। শিক্ষা ও সচ্চরিত্র সংগঠন করাই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের একমাত্র লক্ষ্য। এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমই

জীবনের একটী প্রধান সংস্কার উপনয়নে ইহার আরম্ভ। অনুপনীতের বিবাহে অধিকার নাই—অশিক্ষিত ও অগঠিতচরিত্র গৃহস্থধর্ম্মে অনধিকারী। আজকাল আমরা বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য কতই না আন্দোলন করিতেছি; কিন্তু ধর্ম্মসংস্কারের মধ্য দিয়া অতি প্রাচীন যুগে এই ভাবে হিন্দু দ্বিজাতির মধ্যে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম হিসাবে শিক্ষা ও চরিত্রের সংগঠনের কি সুন্দর নিয়ম ছিল। এই সকল নিত্যশুভকর নিয়ম আমরা প্রাণহীন আচারে পর্য্যবসিত করিয়া আত্মহত্যার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া বসিয়া আছি।

ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা প্রকৃতপক্ষে জীবনে শিক্ষা ও সংগঠনের অবস্থা। এই সময়ে বালকের মন কোমল ও সরল থাকে। সুতরাং এই সময়ে তাহার জীবনের গঠন অতি সুন্দর ভাবেই ও অতি সহজেই সাধিত হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় শিক্ষা ও সংযম সাধনাই একমাত্র লক্ষ্য। উপনয়নের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের আরম্ভ। ব্রহ্মচারী প্রধানতঃ সংযমশীল বিদ্যার্থী। বিদ্যা বলিতে প্রাচীন ভারতবর্ষে অর্থকরী বিদ্যা বুঝাইত না—বিদ্যা অর্থাৎ বেদ বা জ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম অধিগত হয়। ব্রহ্মচারী না হইলে বেদবিদ্যা অধিগত হয় না। পূত ও পবিত্র না হইলে কেহই জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। এক্ষণে বিদ্যার সহিত চরিত্রসংগঠনের কোন সম্বন্ধই নাই—শুকপক্ষীর ন্যায় কতিপয় বস্তু কণ্ঠস্থ করিয়া অধিগত করিলেই বিদ্বান্ হওয়া যায় না। মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তোলা বা পারিভাষিক শব্দে ধর্ম্মজীবন সংগঠন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান শিক্ষায় মানুষ হিসাবে আমাদের কোন উন্নতিই হইতেছে না, বরং আমরা ভোগলোলুপ হইয়া সংযম হারাইয়া মনুষ্যত্বে হীন হইতেছি। এরূপ শিক্ষায় আমরা নিজেদের অনিষ্ট করিতেছি এবং কোমলহৃদয়া বালিকাদের মধ্যে এই ধর্ম্মশূন্য নীতিশূন্য

সমাজবিপ্লবকারিণী শিক্ষার প্রচার করিয়া স্বখাতসলিলে ডুবিয়া মরিতে চলিতেছি।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান কথা সর্ব্বপ্রকারে ইন্দ্রিয়সংযম, কৃচ্ছ্রসাধন, ব্রতচর্য্যা ও বেদাধিগম। ভগবান্ মনু ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের নিয়ম বলিতেছেন—

নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
দেবতাভ্যর্চ্চনঞ্চৈব সমিদাধানমেব চ॥
বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধমাল্য রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধংং লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্॥
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরীবাদং তথানৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥
একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥

অতএব ব্রহ্মচর্য্যে নিত্যস্নান, দেব, ঋষি, পিতৃ তর্পণ, দেবার্চ্চন সমিদাহরণ বিহিত। বিলাসব্যসন সকলই সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জিত হইয়াছে এবং কষ্টসহিষ্ণুতা, ক্ষুত্তৃষ্ণা শীততাপ সহ্য করিবার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, রস, স্ত্রী, শুক্ত, প্রাণিহিংসা অভ্যঙ্গ, অঞ্জন, পাদুকা, ছত্র, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, নৃত্য, বাদ্য, দ্যূত, জনবাদ, নিন্দা, মিথ্যা সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীসংস্পর্শ বর্জ্জিত হইয়াছে। এই অসংযম ও স্বেচ্ছাচারিতার দিনে যদি সর্ব্বতোভাবে এই কঠোর নিয়ম পালন করা সম্ভব না হয়, ইহার অনুকল্পস্বরূপ ব্রতাদি ধারণ সকলেরই

কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাদুকার ব্যবহার সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে পাদুকা ব্যবহার বর্জ্জন এ যুগে সর্ব্বত্র সম্ভব নহে, তবে এই সকল পাদুকা যেন বিলাসভাবের দ্যোতক না হয়। ছাত্রাবস্থায় বালকদিগকে থিয়েটার, বায়োস্কোপ প্রভৃতিতে না যাইতে দেওয়া একন্তভাবে কর্ত্তব্য। অধুনা যে সকল কামোদ্দীপক উপন্যাস লিখিত হইতেছে তাহা যেন ছাত্রদের পড়িতে না দেওয়া হয়। এই ভাবে ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মের প্রত্যেক বিধি আক্ষরিকভাবে পালন করা সম্ভব না হইলে অন্ততঃ ইহার অভ্যন্তরীণ ভাব (inner spirit) পালন করিবার একান্ত চেষ্টা বিধেয়। ব্রহ্মচর্য্যের মূলকথা কামজয়—জগতে যিনি কামজয় করিয়াছেন. তাঁহার আর কিছু করিবার নাই। যিনি কামজয় করিয়াছেন, তিনি ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন—এই কামজয়ের পরিপাটী প্রণালী ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মে শিক্ষা দেওয়া হয়। বালক যখন দ্বারে দ্বারে গিয়া 'মা ভিক্ষা দেও' বলিয়া ভৈক্ষচর্য্যা করে তখন যে সে স্বতঃই স্ত্রীমূর্ত্তিমাত্রেই মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। এই ব্রহ্মচর্য্য কেবল স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ ও সংস্পর্শবর্জ্জন নহে—ইহা অষ্টাঙ্গ মৈথুনবর্জ্জন। মহর্ষি পতঞ্জলি এই ব্রহ্মচর্য্যসাধনে অসাধারণ বীর্য্যলাভ ঘটে বলিয়া গিয়াছেন। ভারতের সাধনায় নারী পুরুষের সহধর্ম্মিণীরূপে কল্পিত হইয়াছেন—অন্যথা নারী প্রলয়ঙ্করী বলিয়া সর্ব্বত্র নিন্দিত হইয়াছেন। সুতরাং বাল্যকাল হইতে আর্য্যসন্তান যাহাতে এই আদিম অদম্য রিপু হইতে পরিত্রাণ পায়, সেই ব্যবস্থাই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে বিশেষ ভাবে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য আদ্যন্ত জীবনের একটী প্রকাণ্ড সংযমসাধনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার মধ্যে আমরা এই কয়টী বিষয় বিশেষ ভাবে দেখিতে পাই।

১। গুরুসেবা।

২। সংযমসাধনা।

৩। বিদ্যার্জ্জন।

গুরুসেবা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের প্রধান কথা। 'আচার্য্যদেবো ভব'—ইহাই উপনিষদের কথা। গুরু স্বয়ং ব্রহ্মের মূর্ত্তি। গুরুকে সর্ব্বতোভাবে, কায়মনোবাক্যে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে হইবে। নচেৎ বিদ্যা অধিগত হইবে না। গুরুভক্তি ও ইন্দ্রিয়সংযম ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ। যদি ইন্দ্রিয় সংযত না থাকে, অধিগত বিদ্যার কোন অর্থই নাই। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটী দুর্ব্বল হইলে সর্ব্বজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়।

ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥

সুতরাং ব্রহ্মচারী প্রাতঃকালে উত্থানপূর্ব্বক শৌচস্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক সমিৎকুশপুষ্পাদি আহরণপূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া বেদাদিপাঠনিরত হইবে। পশ্চাৎ ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহা গুরুকে নিবেদন করিবে। অনন্তর মধ্যাহ্নসন্ধ্যাদি করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে গুরুসেবা করিবে। পশ্চাৎ পুনঃ পাঠে মনঃসংযোগ করিবে। সন্ধ্যায় বন্দনাদিপূর্ব্বক রাত্রিতে লঘু আহার গ্রহণ করিয়া গুরুদেব শয়ন করিলে স্বয়ং কুশকম্বলাদি আসনে শয়ন করিবে এবং ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিবে। ব্রহ্মচর্য্যজীবন পরম পবিত্র—ইহা সর্ব্বতোভাবে সংযত ও নির্ম্মল জীবন। এ জীবনের পরম পবিত্র সাধনা জ্ঞানার্জ্জন। আর্য্যজাতি জ্ঞান বলিতে আধুনিকভাবের জ্ঞান বুঝিতেন না—ইহা বিশেষ ভাবে বেদাদি আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের আলোচনা।

বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে।

শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। পুনশ্চ—জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ। হায়, আবার আমরা কবে শান্ত, দান্ত, ধীর স্থির, জিতেন্দ্রিয়, জিতকাম, পরহিতব্রত, জ্ঞানব্রত, বিদ্যার্থী ভারতে দেখিতে পাইব! ভারতের সাধনায় ইহাই যে জাতীয় জীবনের আদর্শ। গুরুদ্রোহী, চপল, ভোগবিলাসী, কামচঞ্চলচিত্ত, উপন্যাসপ্রিয়, নারীসংসর্গলোলুপ ছাত্রের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া আজ হৃদয় বিকম্পিত হয়—আর মনে হয় আজ তরুণ আন্দোলনের নামে দেশে কি জাতিবিপ্লবের প্লাবন আসিয়াছে। আজ তরুণ আন্দোলনের ধ্বংসলীলা দেখিয়া মনে হয় এ যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে? আর বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া বলি,—"হরে মুরারে হরে মুরারে।"

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গার্হস্থ্যাশ্রম। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আর্য্যগণ পূত ও পবিত্র হইয়া পশ্চাৎ গৃহস্থের কঠোর কর্ম্মভার গ্রহণ করিতেন। আমাদের আর্য্যশাস্ত্রের চতুরাশ্রমের ক্রম ভঙ্গ করা সাধারণতঃ নিষিদ্ধ। অনুপনীত ও অবিদ্য ব্যক্তির বিবাহসংস্কার হইতে পারে না। এই উপনয়নসংস্কার আর্য্যসন্তানের পুনর্জন্মস্বরূপ। যথা—জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রধানতঃ ধর্ম্মসংস্কার ঘটে। সুতরাং দ্বিজাতিবর্গের এই সংস্কার কোনমতে বর্জ্জন করা উচিত নহে। শাস্ত্রে যে চতুর্ব্বর্গের কথা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রথমতঃ ধর্ম্মশিক্ষাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রাণ—গার্হস্থ্যে ধর্ম্মাবরোধী অর্থকামের সেবা; এবং অপর দুই আশ্রম প্রধানতঃ মোক্ষসাধক। এই ভাবে চারি আশ্রমে চতুর্ব্বর্গের সেবাই বিহিত হইয়াছে এবং চারি আশ্রম দ্বারা মনুষ্যজীবনকে সফল ও সার্থক করিয়া গঠন করা হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্যাশ্রমকে অতি প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে।

শাস্ত্রে গার্হস্থ্যকে জ্যেষ্ঠাশ্রম বলা হইয়াছে ; তাহার কারণ সকল আশ্রমের উপজীব্য গার্হস্থ্য।

যথা বায়ুংসমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে ইতরাশ্রমাঃ ॥

ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তনপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন ; এই সময়ে তিনি দারপরিগ্রহপূর্ব্বক সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করিবেন ও অগ্নিরক্ষা করিবেন। পূর্ব্বকালে যাগযজ্ঞমূলক কর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম ছিল। এক্ষণে যুগধর্ম্মানুসারে বৈদিক রীতির পরিবর্ত্তে স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিক ধর্ম্মই প্রচলিত। সুতরাং এই সময় আর্য্যসন্তান যথারীতি দীক্ষিত হইয়া স্বধর্ম্মপালন ও ধর্ম্মাবিরোধে অর্থসঞ্চয় ও কামসেবা করিবেন। ৮ হইতে ২৪ বর্ষ সাধারণতঃ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং ২৪ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত গার্হস্থ্যাশ্রম। 'পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ' এই প্রবচন সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। গৃহস্থ অবস্থায় আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য তিনটী ঋণশোধের ব্যবস্থা করা। এই সময়ে কর্ত্তব্য—

১। ঋণত্রয়ের ব্যবস্থা।
২। পঞ্চসূনা পাপের জন্য পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান।
৩। শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া।
৪। সন্ধ্যাবন্দনা (ইহা সর্ব্বত্র নিত্য কর্ত্তব্য)।
৫। কুটুম্বভরণ ও দান।
৬। বৃত্তির অনুযায়ী অর্থোপার্জ্জন।

আমাদের সমগ্র জীবন নানা কর্ম্মের বন্ধনে বদ্ধ। মানব জন্মিয়া মাতাপিতার স্নেহ ও দয়ায় লালিত পালিত—মাতাপিতার নিকট মানবের ঋণ অপরিসীম ও অপরিশোধ্য। তাঁহারা যে ক্লেশস্বীকার ও স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক লালন পালন করিয়াছেন আমাদের সন্তান হইলে তবে

তাহার কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি ও সেইভাবে স্বার্থত্যাগে ও ক্লেশস্বীকারে কথঞ্চিৎ পিতৃঋণের পরিশোধ ঘটে। আমাদের পিতৃবর্গের পূজা, পিণ্ড, শ্রাদ্ধ, তর্পণ ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। পুত্রোৎপাদনে ইহার ব্যবস্থা ঘটে বলিয়া ইহা গার্হস্থ্যজীবনে একটী প্রধান কর্ত্তব্য। জাতিরক্ষা ও বংশবিস্তারের জন্য পুত্রের একান্ত প্রয়োজন। যে হিন্দু হইয়া বিবাহ করে নাই, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া প্রব্রজ্যাও গ্রহণ করে নাই সে অনাশ্রমী। হিন্দুর বিবাহের উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ পুত্রের জন্য, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনম্'। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক মানব যথাশাস্ত্র বিবাহ করিবে ও পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক পিতৃঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিবে। পুত্র না হইলে আর্য্যসন্তানকে নরকগামী হইতে হয়। 'পুৎ' নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া আত্মজের নাম 'পুত্র'— বংশের সম্যক্ বিস্তার করে বলিয়া 'সন্তান' কথার উদ্ভব। মানব যেমন দেহ ও মনের জন্য মাতাপিতার নিকট ঋণী, সেইরূপ স্বীয় জ্ঞানময় জীবনের জন্য ঋষিসঙ্ঘের নিকট ঋণী। যাঁহাদের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া আমাদের মানবজীবন সার্থক সেই জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি রক্ষণাবেক্ষণ ও যথাপাত্রে তাহার ন্যাস জীবনের প্রধান কর্ম্ম। মানবজীবনে সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের ব্যবহার না করার ন্যায় বিষাদময় (Tragic) বস্তু কিছু নাই। এই জ্ঞানচর্চ্চায় ঋষিঋণের ঋণপরিশোধ ঘটে। সর্ব্বশেষে এই জগচ্চক্রের মূলে দৈবীশক্তি—সেই দৈবীশক্তির পোষণ আমাদের প্রধান কার্য্য। এজন্য যজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণের পূজা একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং হিন্দুর কর্ম্মজীবন বিশ্বব্যাপী— পিতৃকুল ঋষিকুল ও দেবকুলের আরাধনা দ্বারা সমগ্র সংসারচক্রের সৌষ্ঠবসাধন ও আত্মার প্রসারসম্পাদন হিন্দুধর্ম্মের প্রধান কর্ম্ম। এই ঋণত্রয়ের সম্প্রসারণ আমরা পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে দেখিতে পাই।

সমগ্র দৈব, জৈব ও প্রাকৃত জগতের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া আপনার ও সর্ব্বভূতের কল্যাণসাধনই গৃহস্থের প্রধান কার্য্য। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে জাতিপংক্তির বিচার দেখিয়া ইহার সঙ্কীর্ণতার অপবাদ দেন তাঁহারা একবার হিন্দুর উদার ধর্ম্মনীতির প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করেন না। কীট, পতঙ্গ, পশুপক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া পিতৃ ও দেবতা পর্য্যন্ত আব্রহ্মস্তম্ব সকলের প্রীতিসাধন আর্য্যসন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য। পঞ্চমহাযজ্ঞে ইহার বিধান রহিয়াছে।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

পঞ্চযজ্ঞের বিভাগ এইরূপ—

১। ব্রহ্মযজ্ঞ
২। দেবযজ্ঞ
৩। পিতৃযজ্ঞ
৪। ভূতযজ্ঞ
৫। নৃযজ্ঞ।

১। ব্রহ্মযজ্ঞ—অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ। নিখিল জ্ঞানভাণ্ডার বেদাদিশাস্ত্রের পঠনপাঠন জগতের পরম কল্যাণের একমাত্র উপায়; এই সাধনায় বিমুখ হওয়া গৃহস্থের পক্ষে ধর্ম্মহানিকর। জ্ঞানেই মানবের মুক্তি, জগতে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু কিছুই নাই,—এই জ্ঞানের অধিকারী হইয়া যে ইহা অনুশীলন না করিল, তাহার জীবন বৃথা। জ্ঞানই বেদ—এই বেদব্রহ্মের অধ্যয়ন অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কলিতে বেদ লুপ্তপ্রায়—অনুকল্পস্বরূপ গীতাদি শাস্ত্র প্রত্যেক হিন্দুরই অবশ্য পঠনীয়। আমাদের ভাণ্ডারে যে কত রত্নরাজি রহিয়াছে,

আমরা তাহার কোন সন্ধান রাখি না। পাপতাপসঙ্কুল কলিযুগে সাধুসঙ্গ একান্ত দুর্লভ, সুতরাং শাস্ত্রাদিপাঠে ঋষিসঙ্গরূপ অবশ্যকরণীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ইহামুত্র কল্যাণলাভের জন্য সকলেরই চেষ্টা কর্ত্তব্য।

২। দেবযজ্ঞ—সৃষ্টজগতের স্রষ্টা, পাতা, নিহন্তা, দেবসম্প্রদায়; আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র সহায়ক। পিতৃকুল, ঋষিকুল ও দেবকুলের তৃপ্তি সাধিত না হইলে জগতের কোন মঙ্গল হইতে পারে না। সংসারচক্রের মূলই এই দেবসমূহ। দেবগণ অগ্নিমুখে নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করেন—

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যজ্ঞচক্রের বর্ণনায় পুনঃ পুনঃ এই অবশ্য-করণীয় দৈবকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন—

দেবান্ ভাবয়তানেন দেবাশ্চ ভাবয়ন্তুবঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥

এই দেবগণ তুষ্ট থাকিলে অকালবর্ষণ, অতিরৌদ্র, মহামারী, রোগ, শোক, পাপ, তাপ, দুঃখ প্রভৃতি সকলই প্রশমিত হয় এবং সর্ব্বতোভাবে আপনার ও জগতের, ইহকালের ও পরকালের শুভ ঘটিয়া থাকে।

৩। পিতৃযজ্ঞ—পিতৃতর্পণই পিতৃযজ্ঞ। এই পিতৃগণ জৈবজগতের আদিকারণ। অন্নময়কোষের সৃষ্টি পিতৃগণের কৃপাকটাক্ষে ঘটিয়া থাকে, পিতৃগণ ঋতুর দেবতা—এবং কালের নিয়ন্তা। এই পিতৃ-গণের প্রীতিতে আপনার ও স্ববংশের কল্যাণ; পিতৃপূজার ফল আয়ুঃ ও আরোগ্য। পিতৃগণ তুষ্ট হইলে সকল দেবতাই তুষ্ট হন। জগতের মূলে পিতৃগণ বর্ত্তমান; কীট, পতঙ্গ, পশুপক্ষী, সরীসৃপ, তির্য্যক্,

চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, ঋষি ও দেবতা, সকলের মূলেই এই পিতৃগণ। ইহাদের পূজায় নিখিলজগতের কল্যাণ—এবং সমগ্রের কল্যাণে প্রত্যেক অংশেরই কল্যাণ। পিতৃতর্পণ আর্য্যসন্তানের অবশ্য করণীয় কর্ম্ম। বিশ্বের সহিত আত্মার এইরূপ মহতো মহীয়ান্ সম্পর্ক পাতিবার কি সুন্দর উপায় এই শ্রাদ্ধতর্পণে রহিয়াছে, তাহা বাক্যদ্বারা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

৪। ভূতযজ্ঞ—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। সর্ব্বভূতে শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান। "প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্"—ভা° ১১।২৯।১৬ কুক্কুর, গো, গর্দ্দভ ও চণ্ডালকে পর্য্যন্ত দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে। ইহা আধ্যাত্মিক জীবনের একটী প্রকাণ্ড সাধন। তুমি নিজে উদরপূর্ত্তি করিবে; আর তোমারই গৃহের ভিতরে বাহিরে কাক, শুক, কুক্কুর, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা উপবাস করিবে, ইহা ত' হইতে পারে না। এক মুঠা ভাত লইয়া ছড়াইয়া দিয়া বল—ওঁ দেবাঃ মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি, সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ। প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্॥ পিপীলিকাকীটপতঙ্গকাদ্যাঃ বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ। প্রযান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং মুদিতাঃ ভবন্তু॥

এই যে ভূতবলি, ইহা ভক্তিভাবে পবিত্রতাসহকারে সম্পন্ন করিতে হইবে। মানব কেবল আপনার স্বার্থ দেখিয়া চলিলে তাহার মানবত্বের বিকাশ ঘটে না। আর্য্যসন্তানের জীবন কেবল স্বার্থপুষ্টির জন্য নহে। 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়' তাহাকে আত্মনিবেদন করিতে হইবে।

৫। নৃযজ্ঞ—মানুষ সামাজিক জীব; মানবের কল্যাণ মানবের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। এইজন্য দয়া, পরোপকার, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতির দ্বারা তাহাকে মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এই নৃযজ্ঞের প্রধান অঙ্গ অতিথিসেবা। অতিথি সর্ব্বদেবময়—যে গৃহ হইতে অতিথি

হতাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, সে স্থলে সে গৃহস্থের পুণ্যগ্রহণপূর্ব্বক তাহার পাপ প্রদান করিয়া চলিয়া যায়। অতিথির জাতিবিচার নাই, কুলশীলের পরিচয় নাই, তাহার সংকারই আর্য্যের প্রধান কর্ত্তব্য।

এই পঞ্চযজ্ঞ গৃহীমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। এইগুলি গৃহস্থের প্রাণিবধ-জনিত পাপের নাশক।

পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্॥
তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চকৢপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্॥

চুল্লী, শিলনোড়া, সম্মার্জ্জনী, জলকলস, উদুখলে নিত্য প্রাণিহত্যা ঘটে। এই সকল পাপের নিষ্কৃতির উপায় পঞ্চমহাযজ্ঞ; ইহা যে কেবল পাপহারক তাহা নহে—ইহা জীবনের একটী প্রধান সাধনা। এই সাধনায় আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আত্মার বিশেষ সম্প্রসারণ ঘটে।

গৃহস্থের জীবনে আর একটী প্রধান কর্ম্ম, শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করা। অষ্টকা, শ্রাবণী, অশ্বযুজিঃ, অগ্রহায়ণী, চৈত্রী শ্রাদ্ধাদি করা গৃহস্থাশ্রমে বিশেষভাবে উপদিষ্ট। শ্রাদ্ধকর্ম্মে পিতৃগণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া আমাদের যে কেবল আত্মপ্রসাদ ও আত্মোৎকর্ষ ঘটে তাহা নহে, পরন্তু এই শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া দ্বারা অনেকে কঠিন বিপদ ও কঠোর পীড়া হইতে রক্ষা পাইয়াছে। পিতৃগণের পূজার জন্যই সন্তান কামনা। যে পুত্র পিতৃলোকের প্রীতি সম্পাদন না করে, তাহার নরজন্ম একান্ত নিরর্থক।

এই গৃহস্থাশ্রম পরম পবিত্র; সদাচারপালন সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মকরণ, ন্যায়তঃ ধনোপার্জ্জনপূর্ব্বক আত্মীয়কুটুম্ব ও দীনজনপালন ইহাই গৃহস্থের

কর্ত্তব্য। গৃহস্থের কল্যাণ বহুলভাবে পত্নীর উপর নির্ভর করে—পত্নীই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যে গৃহে নারীগণ পূজিত ও আদৃত হ'ন, সেই গৃহ নিত্যকল্যাণের ক্ষেত্র।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

এই গৃহস্থাশ্রম বন্ধনের হেতু বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু বন্ধনের কারণ আশ্রম নহে, 'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ'। পরন্তু ইহাই স্মরণীয়—

ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য গৃহে চৈব বসেন্নরঃ।
তত্র হি তস্য কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করং তথা॥

স্বকর্ম্মধর্ম্মার্জ্জিতজীবিতানাং শাস্ত্রেষু দারেষু সদারতানাম্।
জিতেন্দ্রিয়াণামতিথিপ্রিয়াণাং গৃহেঽপি মোক্ষঃ পুরুষোত্তমানাম্॥
ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপিস্যাদ্ যতঃ স আস্তে সহষট্সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়াস্যাত্মরতের্বুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিং ন করোত্যবদ্যম্॥
বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ
আসক্তচিত্তস্য বনং নিরোধনং নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥

গৃহস্থাশ্রমের পর বানপ্রস্থাশ্রম। গৃহস্থ যখন দেখিবেন আপনার চর্ম্ম লোল হইয়াছে; মৃত্যুর অগ্রদূতরূপে জরা দেহ আক্রমণ করিয়াছে, পুত্রের যখন পুত্র হইয়াছে, তখন গৃহী বনে গমন করিবে। জীবনের অর্দ্ধেক যখন অতিক্রান্ত, তখন মানব অবশ্য অবশ্য পরকালের চিন্তা করিবে। এইবার মোক্ষমার্গে চলিতে হইবে—জরাব্যাধি জননমরণের সংসৃতিচক্র হইতে উদ্ধারের উপায় করিতে হইবে। মায়ামোহপাশ

কাটাইয়া অহং মম বুদ্ধি ত্যাগপূর্ব্বক সকল বাসনা কামনা ত্যাগ করিয়া আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করিবার জন্য বানপ্রস্থাশ্রমের ব্যবস্থা। এই আশ্রমে কঠোর তপস্যাই বিহিত।

১। বনে বাস

২। সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ ও জটাচীর ধারণ

৩। সামান্য আহার

৪। আহার সংযম—উপবাসাদি শিক্ষা—চান্দ্রায়ণব্রতাদি পালন

৫। তপস্যা—পঞ্চতপাঃ প্রভৃতির পালন

৬। উপনিষদাদি গ্রন্থের আলোচনা ও আত্মচিন্তা

৭। পঞ্চযজ্ঞ সাধন

যে জীবনের ব্রহ্মচর্য্যরূপ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা সেই জীবনের অন্ত সর্ব্বত্যাগরূপ তপস্যায়। মহর্ষি বিষ্ণু এই আশ্রমবর্ণনার উপসংহার এইরূপ ভাবে করিয়াছেন—

তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবমানুষজং জগৎ।
তপোমধ্যং তপোঽন্তঞ্চ তপসা চ তথাধৃতম্।
যদ্দুশ্চরং যদ্দুরাপং যদ্দূরং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বং তত্তপসঃ সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥

আর্য্যধর্ম্মের মূল লক্ষ্য মানবের ধর্ম্মজীবনের উন্নতি; এই জন্য বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা। কিন্তু কলির দুরূহ প্রভাবে মানবের তপঃশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এইজন্য বানপ্রস্থ আশ্রমের অনুকল্প-স্বরূপ তীর্থবাস, শাস্ত্র, উপবাস, জপ, ধ্যানধারণায় কালক্ষেপ পূর্ব্বক পরকালের জন্য সকলেরই প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। কেহ কেহ মনে করেন, লৌকিক কর্ম্মত্যাগে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তাঁহাদের

বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে জীবনের সারাংশ লৌকিক কর্ম্মে ব্যয় করিয়া পুনশ্চ সেই কর্ম্মে আসক্ত থাকিলে জীবনে আর আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ উৎসারিত হইবে না। কর্ম্ম ত' আছেই—কর্ম্মীরও অভাব নাই—জীবনের সন্ধিক্ষণে আর বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত না থাকাই ভাল। এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।

এই বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস। সন্ন্যাস আশ্রম অতি কঠোর। সর্ব্বপ্রকার আসক্তি ও এষণা ত্যাগই সন্ন্যাস। এই আশ্রম মানবজীবনের চরম গন্তব্যস্থল—এই আশ্রমের প্রশংসায় শ্রীভগবান্ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন "সন্ন্যাসো মে মূর্দ্ধ্নি স্থিতঃ"। কিন্তু অতি কঠোর বলিয়া কলিতে এই আশ্রম নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই আশ্রমের প্রধান লক্ষণ তীব্র বৈরাগ্য। যখনই বৈরাগ্য অতি তীব্র হইবে, তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। ফল পাকিলে আপনি পড়িয়া যায়—বৈরাগ্য ঘটলে তবে সন্ন্যাসের উপযোগিতা আসে। নচেৎ সন্ন্যাসগ্রহণ মর্কটবৈরাগ্যমাত্র। সন্ন্যাসে মানবের নূতন জীবন ঘটে—ইহা আইন অনুসারে মৃত্যুতুল্য (civil death)। সন্ন্যাসের পর পূর্ব্বাশ্রমের সহিত কোন সম্পর্কই থাকে না। এই আশ্রমে আত্মচিন্তা বা আধ্যাত্মিক উন্নতিই একমাত্র কার্য্য। যতি লোকালয় ও লোকসংসর্গ ত্যাগ করিবেন—তাঁহার অর্থৈষণা, পুত্রৈষণা, বা যশোলালসা থাকিবে না। তিনি ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করিবেন, কোন প্রকার প্রাণিহিংসা করিবেন না, কামিনীকাঞ্চন হইতে দূরে থাকিবেন। আজকাল দেশে গৈরিকবস্ত্রধারী সন্ন্যাসীর পল্টনের আবির্ভাব দেশের দুঃসময়ের সূচনা করিতেছে। সন্ন্যাসী হারমোনিয়ম লইয়া গান করিয়া ভিক্ষা করিতেছে; গৈরিকধারী বামে সুসজ্জিত স্ত্রীলোকের দল লইয়া ফিরিতেছে; সন্ন্যাসীর দল মেয়েদের জড় করিয়া ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছে; বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসিয়া সন্ন্যাসী-

মহারাজ Alfonso ল্যাংড়া আম তাকের উপর সাজাইয়া রাখিতেছেন ; সন্ন্যাসীর 'আনন্দ' সংযুক্ত নামের পার্শ্বে M. A., B. A. উপাধি ; এই সকল দেখিয়া বাস্তবিকই মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। শ্রীচৈতন্যদেবকে জগদানন্দ গন্ধতৈল মাখাইতে চান—'জগদানন্দ চাহে মোরে বিষয়-ভুঞ্জাইতে' বলিয়া সে তৈলভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। ছোট হরিদাস সাড়ে তিন জনের অর্দ্ধেক পরমবৈষ্ণবী শিখী মাহিতীর ভগিনীর নিকট অন্নভিক্ষা করিয়াছিল বলিয়া চৈতন্যদেব তাঁহাকে বর্জ্জন করেন। বৈষ্ণব হইয়া প্রকৃতির মুখদর্শন মহাপাপ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। সনাতনের গাত্রে ভোটকম্বল দেখিয়া তিনি দৃষ্টিপাত করিলে তিনি কম্বল ফেলিয়া দেন। এই তো কঠোর সন্ন্যাস! আর আজ এই আশ্রমধর্ম্মের কি পরিবর্ত্তন! আমরা অন্ধ হইয়া এই বিরিঞ্চিবাবাদের মাথায় তুলিতেছি—নিজ, পত্নী, কন্যা ও ভগিনীগণের মধ্যে পর্য্যন্ত এই আশ্রমদূষক স্বৈরাচারী ভণ্ড পরস্বাপহারীদিগকে নির্ব্বিচারে গতায়াত করিতে দিতেছি।

প্রকৃত সন্ন্যাসী কে?

১। যিনি সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়জয় করিয়াছেন ;

২। যাঁহার কোন কামনা বাসনা নাই ;

৩। যিনি 'আমি' 'আমার' এইরূপ অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছেন ;

৪। যিনি কামিনীকাঞ্চন দূরে ত্যাগ করিয়াছেন ;

৫। যিনি নাম চাহেন না ;

৬। যিনি স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করা দূরে থাকুক, তাহার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করেন না ;

৭। যাঁহার সঞ্চয়বুদ্ধি নাই।

৮। সন্ন্যাসী সাধনসম্পন্ন ও ঈশ্বরভক্ত হইবেন।

যে সকল ব্যক্তির মধ্যে এই সকল গুণ নাই, সেই সকল ধর্ম্মধ্বজী-দিগকে কখনও সন্ন্যাসীর মর্য্যাদা দিবেন না। এই শ্রেণীর ব্যক্তি Social worker বা philanthropist হইতে পারেন, কিন্তু ইঁহারা সন্ন্যাসী নহেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দশসংস্কার।

সনাতন আর্য্যধর্ম্মে দেহ ও আত্মার পবিত্রতা সম্পাদক কতিপয় সুপ্রথা আছে। এই সকল রীতি সনাতন ধর্ম্মে সংস্কার নামে খ্যাত। এই সংস্কার দশটী। ইহাদের মধ্যে একটীতেও যাহার অধিকার নাই, সে প্রকৃতপক্ষে সনাতনধর্ম্মাবলম্বী নহে। এই সকল সংস্কার দ্বিজাতিবর্গের অবশ্য করণীয় কর্ম্ম।

বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥

এই শুদ্ধিকার্য্য জন্মের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে।

জন্মপূর্ব্ব সংস্কার তিনটী	গর্ভাধান	(১)
	পুংসবন	(২)
	সীমন্তোন্নয়ন	(৩)
জন্মকালীন শৈশবসংস্কার	জাতকর্ম্ম	(৪)
	নামকরণ	(৫)
	অন্নপ্রাশন	(৬)
বাল্যকালীন সংস্কার	চূড়াকরণ	(৭)
	উপনয়ন	(৮)
	সমাবর্ত্তন	(৯)

যৌবনে প্রায়শঃ ২৪ বা ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিবাহ (১০)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আর্য্যগণ জীবনকে অত্যন্ত পবিত্র দেখিতেন। এইরূপ পাবিত্রীকৃত জীবনের ধারণা অতি দুর্ল্লভ। এই সংসারে কে না শান্ত, দান্ত, স্থির, কর্ম্মী, প্রসন্নভাগ্য পুত্রলাভের আশা করেন। কিন্তু পুত্র জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেও আর্য্যগণ দেবতার আরাধনা করিয়া সুপুত্র প্রার্থনা করিতেন। রজোদর্শনের দিন হইতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিন ত্যাগপূর্ব্বক যুগ্মদিনে প্রশস্ত তিথিতে শুভলগ্নে সুপুত্রলাভার্থ পতি পত্নীর সহিত সঙ্গত হইতেন। তাঁহার প্রার্থনা—

জীববৎসা ভব ত্বং হি সুপুত্রোৎপত্তিহেতবে।
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বকল্যাণি অবিঘ্নগর্ভধারিণী॥

ওঁ দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে॥ ইহাই গর্ভাধান সংস্কার।

পরে গর্ভের তৃতীয় মাসে শুভদিনে বৃদ্ধিহোমাদিপূর্ব্বক পতি পত্নীর নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া প্রার্থনা করেন—

ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ।
পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে॥

আর্য্য পুত্রেরই একান্তভাবে প্রার্থনা করে; কারণ পুত্রদ্বারা বংশ-স্থিতি, শ্রাদ্ধাদি পৈতৃক কার্য্যের আশা, ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সিদ্ধি। গর্ভে পুত্রসন্তান জাত হউক, পুংসবন ক্রিয়ার ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য। সন্তান হিসাবে আর্য্যসংসারে কন্যার বিশেষত্ব নাই। পিতার নিকট কন্যা ন্যাসস্বরূপ, দানেই ইহার সার্থকতা; কন্যাদান পূর্ব্বক পিতা দায়মুক্ত হ'ন। গৃহিণী ও জননীরূপে নারীজীবনের সার্থকতা। সুতরাং আর্য্যগণ যে একান্তভাবে পুত্রের কামনাই করিবে, তদ্বিষয়ে বিস্মিত হইবার কারণ কিছুই নাই।

সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারে গর্ভিণীর মঙ্গলকামনা করা হয়। দুইটী যজ্ঞ-ডুমুরের ফল বাঁধিয়া পতি হোমাদি সম্পাদনপূর্ব্বক পত্নীর গলায় বন্ধন করিয়া প্রার্থনা করেন—

অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষে উর্জ্জীব ফলিনী ভব।
পর্ণং বনস্পতে নুত্ত্বা নুত্ত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ॥

পরে সাজারুর কাঁটা ও সূত্রপূর্ণ তর্কু দিয়া তাহার সীমন্তের কেশ উন্নয়ন করা হয়। ইহার শেষমন্ত্র 'বীরসূস্ত্বং ভব পত্নী ত্বং ভব'। কি সুন্দর প্রার্থনা! আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে, অবিশ্বাসের ঘোরে পড়িয়া এইরূপ কল্যাণ হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিতেছি।

প্রকৃত কথা বলিতে কি, আর্য্যগণ মন্ত্রশক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন এবং এই সকল মন্ত্রাদি দ্বারা জীবাত্মার নানা কল্যাণ সাধিত হয় এবং এরূপপক্ষে সাধু জীবাত্মাই গর্ভে প্রবেশ করে। এই সকল মন্ত্রদ্বারা অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় প্রভৃতি কোষের বিশেষভাবে সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটে। শ্রীভগবান্ যেমন পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ মন্ত্রাদি দ্বারা নিষিক্ত গর্ভ তিনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন—এ তিনটী সংস্কার জন্মের পূর্ব্বেই সাধিত হইয়া থাকে।

পুত্রের জন্মের পর পবিত্রতা সম্পাদক ক্রিয়া জাতকর্ম্ম। এই সংস্কারে স্বর্ণপাত্রে ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পুত্রের জিহ্বা পরিষ্কৃত করা হয়। পরে শিশুর নাড়ীচ্ছেদ ও শিশুকে স্তন্যদান করা হয়।

নিষ্ক্রমণ ক্রিয়ায় শিশুকে চন্দ্রদর্শন করান হইয়া থাকে। মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক শিশুর মঙ্গল কামনা এই সংস্কারের উদ্দেশ্য।

শিশুর নামকরণ সংস্কারে নাম ঠিক করা হয়। প্রত্যেক সংস্কারে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অর্থাৎ জাতকের আয়ুঃ ও কল্যাণের জন্য মাতাপিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের শ্রাদ্ধাদি করা হয়। পিতৃগণ আমাদিগের অন্নময় কোষের দেবতা—তাঁহাদের প্রীতি-সম্পাদন সকল কর্ম্মে প্রথমতঃ বিধেয়। শ্রাদ্ধ ও হোম সংস্কারে তাহা বিহিত হইয়াছে। নামকরণে ব্রাহ্মণের শুভসূচক নাম, ক্ষত্রিয়ের বলসূচক, বৈশ্যের ধনযুক্ত, শূদ্রের দাসাদিসূচক নাম রাখিবে। স্ত্রীলোকের নাম সুখোচ্চার্য্য, মঙ্গলসূচক, মনোহর, স্পষ্টার্থ হইবে। স্ত্রীলোকের নদীবাচক (গঙ্গা ভিন্ন) নাম রাখিবে না।

নামকরণের পর অন্নপ্রাশন। ইহাতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদির পর শিশুর মুখে প্রথম অন্নদান করা হয়। শিশুর ষষ্ঠ বা অষ্টম (সাবন) মাসে অন্নপ্রাশন হয়। এদেশে সাধারণতঃ অন্নপ্রাশনের সময় পূর্ব্বের সকল সংস্কার হয়। অর্থের অভাব, অজ্ঞান ও আলস্য ইহার কারণ। যথাসময়ে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই পূর্ণ ফলোপদায়ক হয়, পরে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম প্রত্যবায় হইতে রক্ষা করে মাত্র।

চূড়াকরণ ও কর্ণবেধ সপ্তম সংস্কার। বঙ্গদেশে উপনয়নের সহিত এই সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। মাথার কেশ ক্ষুরের দ্বারা মুণ্ডিত করা হয় ও কর্ণবিদ্ধ করিয়া কুণ্ডল বা সূত্র পরাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বালকের দীর্ঘায়ুঃ কামনা করা হয়—ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষম্। কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্। অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষম্। যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্। তত্তে অস্তু ত্র্যায়ুষম্।

অষ্টম সংস্কার উপনয়ন। উপনয়নের অর্থ সমীপে লইয়া যাওয়া অর্থাৎ বালককে গুরুসমীপে লইয়া যাওয়া। এই সময়ে বালক যজ্ঞকরণ পূর্ব্বক ত্রিবৃৎ সূত্র ধারণ করে। ব্রাহ্মণ অষ্টমবর্ষে, ক্ষত্রিয় একাদশ ও বৈশ্য দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইবে ; গর্ভ হইতে ব্রাহ্মণের ষোড়শ, ক্ষত্রিয়ের

দ্বাবিংশতি ও বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতি বৎসর যেন উত্তীর্ণ না হয়। এই সময়ে ব্রাহ্মণ দণ্ডধারণ করিবে—এই দণ্ড মনের সংযমের দ্যোতক; ত্রিবৃৎ উপবীত ব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দের দ্যোতক। উপনয়নের পর দ্বিজ ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণপূর্ব্বক নিত্য বেদাধ্যয়ন ও সাবিত্রী জপ করিবে। এই সময় ব্রহ্মচারী সর্ব্বপ্রকারে ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিবে, সর্ব্বদা গুরুসেবা করিবে এবং ভিক্ষা করিয়া যাহা লাভ হইবে, তাহা গুরুকে নিবেদন করিবে; শীতাতপ, দুঃখকষ্ট, ক্ষুধাতৃষ্ণা সহ্য করিতে শিক্ষা করিবে ও কোনপ্রকারে ইন্দ্রিয়ের সেবা করিবে না। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের বর্ণনায় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এই উপনয়ন সংস্কারে আরম্ভ ও সমাবর্ত্তনে শেষ।

সমাবর্ত্তনের অর্থ ঘুরিয়া আসা বা প্রত্যাবর্ত্তন করা। এই সংস্কারে শিষ্য আচার্য্যকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া দণ্ড ও মেখলা ত্যাগপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই সংস্কারের প্রধান অঙ্গ মহাব্যাহৃতি হোম।

আর্য্যসন্তানের শেষ সংস্কার বিবাহ। এই বিবাহ সংস্কারে সর্ব্ববর্ণের অধিকার—বিবাহের পর গৃহস্থাশ্রমের আরম্ভ। হিন্দুর বিবাহ অতি চমৎকার ব্যাপার—ইহা চুক্তিমূলক নহে; ইহা সংস্কার—ইহা দ্বারা আত্মার পবিত্রতা, সাংসারিক সুখ ও ধর্ম্মানুশীলন হয়। সুতরাং হিন্দুর সংসারে স্ত্রী ধর্ম্মকর্ম্মের মূল। স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মকার্য্য করাই বিধি—সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ। পতিপত্নীর একাত্মতার এরূপ সুকল্পনা জগতের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। হরগৌরী, লক্ষ্মীনারায়ণ ও সীতারাম আর্য্য পতিপত্নীর সম্বন্ধ নির্ণায়ক। পতির অভাবে পত্নী ব্রহ্মচারিণী। সবর্ণা, অসগোত্রা, মাতার অসপিণ্ডা, সুলক্ষণা, সুশীলা, বিনীতা, গৃহকর্ম্মাদিতে শিক্ষিতা এরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে। হিন্দুধর্ম্মে আট প্রকার

বিবাহের নাম থাকিলেও এক্ষণে মাত্র ব্রাহ্ম ও আসুর বিবাহই প্রচলিত।

১। ব্রাহ্মবিবাহ—সালঙ্কারা কন্যাকে বিদ্বান্ ও সদাচার পাত্রে সম্প্রদানকে ব্রাহ্মবিবাহ বলে। ‘পণপ্রথা’ দেশাচার মাত্র; শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ নাই। যাঁহারা এই প্রথার অনুমোদন করেন, তাঁহারা অতি অধর্ম্ম ও গর্হিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

২। দৈববিবাহ—যজ্ঞের পর পুরোহিতকে যে কন্যাদান করা হয়, তাহার নাম দৈব। দৈবকার্য্যসিদ্ধিকামনায় এই কন্যাদান করা হয় বলিয়া ইহার নাম দৈববিবাহ।

৩। আর্ষ বিবাহ—ধর্ম্মের নিমিত্ত বরের নিকট হইতে এক বা ততোঽধিক বলীবর্দ্দ গ্রহণপূর্ব্বক যে কন্যাদান, তাহা আর্ষবিবাহ।

৪। প্রাজাপত্যবিবাহ—‘তোমরা উভয়ে ধর্ম্মাচরণ কর’ বলিয়া যে সালঙ্কারা কন্যাদান, তাহাই প্রাজাপত্য। সুতরাং এই কন্যাদানের সর্ত্ত ‘তোমরা ধর্ম্মাচরণ করিবে’।

৫। আসুরবিবাহ—স্বেচ্ছামতে কন্যার পিত্রাদিকে ধনাদি দিয়া যে বিবাহ, তাহার নাম আসুরবিবাহ।

৬। গান্ধর্ব্ব বিবাহ—স্বেচ্ছায় বরকন্যা যথায় মিলিত হয় ও পরে হোমসংস্কার দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ববিবাহ বলে। ভগবান্ মনু ‘মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ’ বলিয়া ইহার নিন্দা করিয়াছেন।

৭। রাক্ষসবিবাহ—কন্যাপক্ষীয় লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক যে কন্যাগ্রহণ, ইহাই রাক্ষসবিবাহ।

৮। পৈশাচবিবাহ—নিদ্রায় অভিভূতা, মদ্যপানে বিহ্বলা বা উন্মত্তা স্ত্রীলোককে নির্জ্জনে ধর্ম্মনাশ করা 'পৈশাচোঽষ্টমাধমঃ'। ইহা দণ্ডনীয় (criminal) ও অত্যন্ত নিষিদ্ধ এবং অধর্ম্মজনক। তবে প্রাচীনকালে বর্ব্বর শূদ্রজাতির মধ্যে এই ভাবে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট হইলে ও সন্তান জন্মিলে তাহাকে রক্ষার জন্য এই বিবাহ কেবল শূদ্রের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

হিন্দুবিবাহ ধর্ম্মমূলক। ৮ হইতে ১৩ বর্ষ কন্যার ও ২৪ হইতে ৩০ বর্ষ পুরুষের, বিবাহের প্রশস্ত বয়স বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু কন্যা ঋতুমতী না হইলে কোনমতেই পতির সহিত সঙ্গতা হইবে না। হিন্দুর সংসারে পত্নী পতিকুলের সহিত মিশিয়া যায় বলিয়া বাল্যাবস্থায় কন্যার বিবাহ দেওয়া সুসঙ্গত হইয়াছে। ইহাতে হিন্দুসংসারে দাম্পত্যসুখের বিশেষ উৎকর্ষই ঘটিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে কঠোর রোগগ্রস্ত, যথা যক্ষ্মা, অপস্মার, উন্মাদ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র প্রভৃতি রোগগ্রস্তের বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। নপুংসকেরও বিবাহ অসিদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রে বিবাহ না দেওয়াই ধর্ম্ম; অন্যথা অধর্ম্মসঞ্চার হয়। বিবাহের উদ্দেশ্য গৃহস্থধর্ম্মপালন—দেব, পিতৃ ও অতিথিপূজন। বিবাহের উদ্দেশ্য—পুত্রের উৎপাদন, পালন ও শিক্ষাদান। গৃহস্থের ধর্ম্ম অতি পবিত্র। এইজন্য পতি হোম করিয়া প্রার্থনা করেন—তোমার আমার হৃদয় এক হউক; আমরা যেন উভয়ে ধর্ম্মপালন করিতে পারি। এই বিবাহের প্রথম ব্যাপার সম্প্রদান; দ্বিতীয় ব্যাপার কুশণ্ডিকা, লাজহোম, সপ্তপদীগমন প্রভৃতি। এই কুশণ্ডিকা ব্যাপারের মন্ত্রার্থ যে কি সুন্দর ও গম্ভীর, তাহা পাঠ করিলে অনির্ব্বচনীয় বিশ্বাস ও আনন্দে আপ্লুত হইতে হয়। পতি পত্নীর আয়ুঃ, পুত্র, যশঃ, ধর্ম্ম ও সদাচার প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি পশু, অন্ন ও

পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি পত্নীর পাণিগ্রহণ করিয়া বলিতে-ছেন,—"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি, মম চিত্তমনু চিত্তং তেঽস্তু।" আবার স্ত্রী বলিতেছেন,—ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্।" পতি বধূকে দেখিয়া বলিতেছেন—

"ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইষম্॥

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রাদ্ধ।

যাহা শ্রদ্ধার সহিত মৃত পিতা মাতা পিতৃকুল ও গুরুজনবর্গের উদ্দেশ্যে অর্পিত হয় তাহাই শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের অবশ্য করণীয় কর্ম্ম। দরিদ্র ও নিঃসম্বল ব্যক্তির যদি কোন দ্রব্যাদি নিবেদন করিবার না থাকে, তিনি নির্জ্জনস্থানে গিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া পিতৃকুলকে আহ্বান করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক আপনার শ্রদ্ধা নিবেদন করিবেন। ভগবান্ রামচন্দ্র বনবাসকালে দ্রব্যাভাবে বালির পিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ এতদ্দ্বারা শ্রাদ্ধে যে শ্রদ্ধারই একান্ত প্রাধান্য তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

সর্ব্বাভাবে বনং গত্বা কক্ষামূলপ্রদর্শকঃ।
সূর্য্যাদি লোকপালানামাদিমুচ্চৈঃ পঠিষ্যতি॥
ন মেঽস্তি বিত্তং ন ধনং ন চান্যৎ।
শ্রাদ্ধোপযোগ্যং স্বপিতৄন্নতোঽস্মি॥
তৃপ্যন্তু ভক্ত্যা পিতরো ময়ৈতৌ।
ভুজৌ কৃতৌ বর্ত্মনি মারুতস্য॥

বিষ্ণুপুরাণ ৩।৩০—৩১

আর্য্যসন্তান হইয়া যে পিতৃশ্রাদ্ধে রত নহে, তাহার পুত্রজন্ম বৃথা।

জন্মিলেই মরিতে হয়; এবং মৃত্যুর পর পঞ্চভূতবিনির্ম্মিত দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়। [illegible] দেহ দাহ করিলে তেজের অংশ

তেজে, বায়ুর অংশ বায়ুতে, ক্ষিতির অংশ মৃত্তিকায়; জলের অংশ জলে এবং ব্যোমের অংশ ব্যোমে মিশে - দেহ যে পঞ্চভূতে প্রস্তুত, সেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। মানুষের মৃত্যুর পর তাহার আসক্তি যায় না—প্রাণ দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়াও মমত্ববদ্ধ হইয়া দেহের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। দেহের নাশের সহিত তাহার আর দেহের প্রতি আসক্তি থাকে না। এই জন্য মৃতদেহের সমাধি অপেক্ষা দাহই যুক্তিযুক্ত। মৃত্যুর পর আত্মা একটী সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ প্রাপ্ত হয়। এই দেহকে পূর্ণাবয়ব করিবার জন্য ও আত্মার সদ্গতির জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হয়। যদি এই সকল মন্ত্র যথোচিত ভাবে প্রযুক্ত না হয়, অন্তরীক্ষচারী ভূতপ্রেতপিশাচবৃন্দ এই দেহ ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং আত্মারও সদ্গতি হয় না।

পূর্ব্বোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ পিণ্ডৈঃ শবস্যাহুতিযোগ্যতা।
অন্যথা চোপঘাতায় রাক্ষসাদ্যা ভবন্তি হি ॥

মন্ত্রদ্বারা (অপেত বিত বিচ সর্পতাতঃ প্রভৃতি) আত্মাকে এই ধ্বংসশীল পথ হইতে সরাইয়া দিয়া তাহাকে পিতৃলোকের পথে প্রেরণ করা হয়। মানব মরিয়া প্রেত হয়, প্রেত হইতে পিতৃ হয় এবং পিতৃ হইতে দেবতা হয়। প্রেত হইতে কেহ কেহ বা কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পশু, মানব, যক্ষ, রক্ষঃ হইতে পারে ; কেহ ভাবে ঊর্দ্ধগতিতে ভুবঃ, স্বঃ মহঃ, জন, তপঃ, সত্য প্রভৃতি লোকে যাইতে পারে। চতুর্দ্দশ ভুবনে কর্ম্মফলানুযায়ী জীবাত্মা চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে পারে। মানব আত্মা যখন এই দেহ ত্যাগ করে, তৎক্ষণাৎ একটী সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্ত হয়—এই দেহ দশদিনের দশপিণ্ডে পূর্ণতা লাভ করে [গরুড়পুরাণ, উত্তর খণ্ড—ষষ্ঠ অধ্যায় ; ৩১—৩৭]—এই সূক্ষ্মদেহে প্রেত দশ মাস

বিচরণ করে। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ দ্বারা প্রেত পিতৃত্ব প্রাপ্ত হয় বা পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কেবল মৃতব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। পরে শ্রাদ্ধের সময় পিতৃকুলে উর্দ্ধতন তিন পুরুষ ও মাতামহাদির তিন পুরুষকে আহ্বানপূর্ব্বক অন্নতোয় প্রদান করা হয়। এই অন্নতোয়াদি শ্রদ্ধাসহকারে দানই শ্রাদ্ধ বলিয়া খ্যাত। এতদ্ব্যতীত আর্য্যসন্তানকে প্রত্যহ পিতৃতর্পণ করিতে হয়—মন্ত্রপূত তিলোদকদ্বারা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীবের পিতৃপুরুষের তৃপ্তি-সাধনই তর্পণ। এইরূপ শ্রাদ্ধ ও তর্পণের দ্বারা জীবিত ও মৃতব্যক্তির পার্থক্য দূরীভূত হয়। স্বীয় আত্মা ও মনঃ প্রসারিত ও প্রসন্ন হয় পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি ও তজ্জন্য আপনার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হয়। এই শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি না করিলে প্রত্যবায় ঘটে এবং তজ্জন্য ঐহিক অকল্যাণ, অর্থনষ্ট, মনস্তাপ, পুত্রহীনতা, অকালমৃত্যু, রোগ ও নানাপ্রকার বিপৎপাত ঘটিয়া থাকে। বহু স্থলে দেখা গিয়াছে যে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি করার পর বা প্রেত-যোনিপ্রাপ্ত আত্মীয়স্বজনের গয়ায় পিণ্ডদানাদি করিয়া বহুলোকে বিপদ হইতে ও ব্যাধির হাত হইতে ত্রাণ পাইয়াছে। বংশে কেহ প্রেত থাকিলে সে নানাপ্রকার অকল্যাণ করিয়া থাকে। এস্থলে শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদি দ্বারা তাহার প্রেতত্ব মোচন একান্ত বিধেয়। বংশে প্রেত আছে কিনা তাহা জানিবার উপায়ও করুণাময় শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন।

লিঙ্গেন পীড়য়া প্রেতোঽনুমাতব্যো নরৈঃ সদা।
বক্ষ্যামি পীড়াস্তা রাজন্ যা বৈ প্রেতকৃতা ভুবি॥
ঋতুস্যাদফলঃ স্ত্রীণাং যদা বংশো ন বর্দ্ধতে।
ম্রিয়তে চাল্পবয়সঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥

অকস্মাদ্ বৃত্তিহরণমপ্রতিষ্ঠা জনেষু বৈ।
অকস্মাদ্ গৃহদাহঃ স্যাৎ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥
স্বগেহে কলহো নিত্যং স্যাচ্চ মিথ্যাভিশংসনম্।
রাজযক্ষ্মাভিসম্ভূতিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥
অপি স্বয়ং ধনং মুক্তং প্রযত্নাদনবে পথি।
নৈব লভ্যতে নশ্যেত সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥
সুবৃষ্টৌ বৃষ্টিনাশঃ স্যাদ্বাণিজ্যাদতিশর্ম্মণ।
কলত্রং প্রতিকূলং স্যাৎ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥
এবন্তু পীড়য়া রাজন্ প্রেতজ্ঞানং ভবেন্নৃণাম্।
বৃষোৎসর্গো যদি ভবেৎ প্রেতত্বান্মুচ্যতে তদা॥

—গরুড়পুরাণ, উত্তর খণ্ড ১০।৫৭—৬৩

এই প্রেতপীড়া হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় শ্রাদ্ধ; বিশেষতঃ বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। এই বৃষোৎসর্গ পিতৃগণের একান্ত কাম্য। পিতৃগণ সর্ব্বদা এই গাথা গাহিয়া থাকেন—

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেতাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥

যত প্রকার শ্রাদ্ধ আছে, বৃষোৎসর্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা প্রশংসাশাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যাহাদের শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা নাই, সেই সকল জড়মতি ও চার্ব্বাক নাস্তিক্য মতাবলম্বী শ্রাদ্ধের কোনরূপ সারবত্তা নাই এইরূপ বলিয়া থাকে, সেই সকল নাস্তিকদিগের কথা না শুনিয়া করুণাসাগর শাস্ত্র যাহা বলে, তাহাই শ্রবণ করা উচিত। ধর্ম্মের ক্রিয়া অতি সূক্ষ্ম, জড়বস্তুর ন্যায় সর্ব্বত্র তাহা প্রত্যক্ষ করা না যাইলেও তাহা সর্ব্বদা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। 'মরা গরু ঘাস খায় না' এরূপ বাক্যের দ্বারা

যেরূপ পূর্ব্বপুরুষদের অপমান করা হয় সেইরূপ স্বীয় নাস্তিক্য প্রকাশ করা হয়। যদি অন্নতোয় মন্ত্র ও কর্ম্ম দ্বারা পূর্ব্বপুরুষের গ্রাহ্য না হয়, তবে অতি গোপনে ব্যক্ত প্রার্থনা কিরূপে শ্রীভগবান্ শুনিতে পান? স্বর্গ অবধি ত' আমাদের বাণী পৌঁছায় না? জড়বাদী জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হেতুবাদাশ্রয়ী নাস্তিকগণের কুসিদ্ধান্ত কদাচিৎ শ্রবণ করিবে না। তত্ত্বজ্ঞানের ইচ্ছা থাকিলে শ্রদ্ধা ও বিনয়সহকারে শাস্ত্রানুগ বিচারে ও গুরুপাদাশ্রয়ে তাহার সুমীমাংসা সম্ভব। নচেৎ এই সকল 'অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর' বিষয় তর্কদ্বারা বোধগম্য হইতে পারে না। গরুড় একবার নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেন,—"ভগবন্, মৃত ব্যক্তির কিরূপে তৃপ্তি হইবে? নির্ব্বাপিত দীপে তৈলদানে কি ফল? যে যাহার কর্ম্মানুগ গতি লাভ করে; শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া দ্বারা তাহার কি উপকার হয়?" শ্রীভগবান্ বলিলেন—

শ্রুতেঃ প্রত্যক্ষতস্তার্ক্ষ্য প্রামাণ্যং বলবত্তরম্।
শ্রুত্যা তু বোধিতার্থস্য পীযূষত্বাদিরূপতা॥
নামগোত্রং পিতৄণাং বৈ প্রাপকং হব্যকব্যয়োঃ।
শ্রাদ্ধস্য মন্ত্রাস্তদ্বৎ তু উপালভ্যাশ্চ ভক্তিতঃ॥
অচেতনানি চৈতানি প্রাপয়ন্তি কথন্ত্বিতি।
সুপর্ণ নাবগন্তব্যং প্রাপকং বচ্মি তেঽপরম্॥
অগ্নিষাত্তাদয়স্তেষামাধিপত্যে ব্যবস্থিতাঃ।
কালে ন্যায়াগতং পাত্রে বিধিনা প্রতিপাদিতম্॥
অন্নং নয়ন্তি তত্রৈতে জন্তুর্যত্রাবতিষ্ঠতে।
নামগোত্রঞ্চ মন্ত্রশ্চ দত্তমন্নং নয়ন্তি তে॥
অপি যোনিশতং প্রাপ্তাংস্তাংস্তৃপ্তিরুপতিষ্ঠতি।
তেষাং লোকান্তরস্থানং বিবিধৈর্নামগোত্রকৈঃ॥

অপসব্যং ক্ষিতৌ দর্ভে দত্তাঃ পিণ্ডাস্ত্রয়স্তু বৈ।
যান্তি তান্ তর্পয়ন্তোবং প্রেতস্থানস্থিতান্ পিতৄন্॥
অপ্রাপ্তযাতনাস্থানং শ্রেষ্ঠা যে ভুবি পঞ্চধা।
নানারূপাস্তু জাতা যে তির্য্যগ্‌যোন্যাদিজাতিষু॥
যদাহারা ভবন্ত্যেতে পিতরো যত্র যোনিষু।
তাসু তাসু তদাহারঃ শ্রাদ্ধান্নমুপতিষ্ঠতে॥
যথা গোষু প্রণষ্টাসু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথান্নং নয়তে বিপ্র জন্তুর্যত্রাবতিষ্ঠতে॥
পিতরঃ শ্রাদ্ধভোক্তারো বিশ্বেদেবৈঃ সদা সহ।
এতে শ্রাদ্ধং সদা ভুক্ত্বা পিতৄন্ সন্তর্পয়ন্ত্যতঃ॥
বসুরুদ্রাদিতিসুতাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধদেবতা।
প্রীণয়ন্তি মনুষ্যাণাং পিতৄন্ শ্রাদ্ধেষু তর্পিতাঃ॥
আত্মানং গুর্ব্বিণী গর্ভমপি প্রীণাতি বৈ যথা।
দোহদেন তথা দেবাঃ শ্রাদ্ধৈঃ স্বাংশ্চ পিতৄন্ নৃণাম্॥
হৃষ্যন্তি পিতরঃ শ্রুত্বা শ্রাদ্ধকালমুপস্থিতম্।
অন্যোন্যং মনসা ধ্যাত্বা সম্পতন্তি মনোজবম্॥
ব্রাহ্মণৈঃ সহ চাশ্নন্তি পিতরো হ্যন্তরীক্ষগাঃ।
বায়ুভূতাশ্চ তিষ্ঠন্তি ভুক্ত্বা যান্তি পরাং গতিম্॥
নিমন্ত্রিতাস্তু যে বিপ্রাঃ শ্রাদ্ধপূর্ব্বদিনে খগ।
প্রবিশ্য পিতরস্তেষু ভুক্ত্বা যান্তি স্বমালয়ম্॥

"হে গরুড়! শ্রুতির প্রত্যক্ষতা হেতুই বলবত্তর প্রামাণ্য। শ্রুতি-বোধিত অর্থ পীযূষস্বরূপ অর্থাৎ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়পূর্ব্বক যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করিলে ইহ-পর উভয় লোকেই সুখী হইতে পারা যায়। পিতৃলোকের নাম গোত্রই হব্য

কব্যের প্রাপক, আর ভক্তিসংকারে পঠিত শ্রাদ্ধের মন্ত্র সকলও প্রাপক হইয়া থাকে। হে গরুড়! অচেতন মন্ত্রসকল প্রাপক হয় কি প্রকারে? এরূপ আশঙ্কা করিও না; অগ্নিস্বাত্তাদি পিতৃগণ এই কার্য্যের জন্য ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। যাহার উদ্দেশ্যে যোগ্যকালে নাম গোত্র ও মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে ন্যায়ানুমোদিতভাবে অর্জ্জিত যাহা কিছু অন্নাদি যথাবিধি প্রদান করা যায়, তাঁহারা সে উদ্দিষ্টপ্রাণী যেখানে আছে, সেইখানে প্রেরণ করেন। শতযোনি ভ্রমণকারী জীবের সেই যোনিজ সন্তানগণ যদি সেই সেই জন্মের বিভিন্ন নামগোত্রাদি উল্লেখপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে, তবে তাহার প্রত্যেক শ্রাদ্ধ দ্বারা সেই জীবের তৃপ্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপসব্য দান এবং ক্ষিতিতলে কুশোপরি পিণ্ডদানত্রয় প্রেত-স্থাননিবাসী জীবকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে। যাহারা ভূতলে সৎকর্ম্মকারী, সেই সকল জীব নরকভোগ না করিয়াই নানাবিধ যোনিতে জন্মলাভ করে। জীব যেখানেই থাকুক, তাহারা যে জন্মে যে দ্রব্যভোজী হয়, শ্রাদ্ধীয়ান্নও তদাকারে তাহার নিকট উপস্থিত হয়। গাভী হারাইয়া গেলেও যেমন তদীয় বৎস তাহার মাতাকে চিনিয়া লইতে পারে, তদ্রূপ অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃলোক ও সেই শ্রাদ্ধীয়ান্নকে এমন ভাবে প্রেরণ করেন যে, উহা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্নিধানে উপস্থিত হয়। বিশ্বদেবগণ সহ পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া থাকেন ও তাঁহারা উদ্দিষ্ট পিতৃগণের তৃপ্তি বিধান করেন। বসু, রুদ্র, দেবগণ পিতৃগণ শ্রাদ্ধদেবতা; ইহারা সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃলোকের তৃপ্তিবিধান করেন। গর্ভিণী রমণী যেমন দোহদ সেবা দ্বারা নিজের ও গর্ভের উভয়েরই পুষ্টিসাধন করে, তদ্রূপ নরগণ শ্রাদ্ধ করিয়া আপনার এবং পিতৃলোকের পুষ্টি বিধান করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধকাল সমাগত দেখিয়া পিতৃগণ হৃষ্ট হইয়া থাকেন; পরস্পর মনে মনে ধ্যান করিয়া সবেগে শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত হয়েন। বায়ুভূত শরীর-

ধারী অন্তরীক্ষগামী পিতৃগণ ব্রাহ্মণগণ সহ ভোজন করেন। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে যে সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হয়, সে সকল ব্রাহ্মণের শরীরে পিতৃগণ আবিষ্ট হইয়া ভোজনপূর্ব্বক নিজধামে প্রতিগমন করেন।"—গরুড়পুরাণম্ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক নিবেদিত দ্রব্য যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ যখন জাম্ববানের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহার কোন সন্ধান না পাইয়া তাহার মৃত্যু অনুমান করিয়া শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করেন। ফলে সপ্তদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ শ্রাদ্ধে সমর্পিত অন্নে বলবান্ থাকেন এবং জাম্ববান্ অনাহারক্লিষ্ট হইয়া পরাজিত হন। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের শরীর আশ্রয় করিয়া প্রেত বা পিতৃপুরুষ আহার করেন। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট বলিয়া তিনি সর্ব্বোত্তম বাহন বা প্রাপক (medium)। শ্রাদ্ধকার্য্যে ব্রাহ্মণ যত উত্তম হইবে, শ্রাদ্ধ ততই সুফল হইবে। যে সে লোক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধে কোন ক্রিয়া হইতে পারে না বরং তাহাতে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়। শ্রাদ্ধে বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করা নিষিদ্ধ (মনু ৩৷১২৫); বেদানভিজ্ঞ দশলক্ষ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও শ্রেষ্ঠ (মনু ৩৷১৩১)। যাঁহারা শ্রাদ্ধে ভোজন করিবেন তাঁহারা শান্ত দান্ত হইবেন; পূর্ব্বরাত্রে সংযত থাকিবেন। বিকলাঙ্গ, অসচ্চরিত্র, অনাচারী, অশাস্ত্রজ্ঞ ও বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণকে কদাপি শ্রাদ্ধে আনয়ন করিবে না। শ্রাদ্ধ অতি পবিত্র কর্ম্ম—ইহাকে মিত্র কুটুম্ব ও আত্মীয়স্বজন লইয়া মহোৎসব ব্যাপারে পরিণত করা শাস্ত্রে (মনু ৩৷১৩৯—১৪১) নিন্দিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে শ্রাদ্ধাদিতে মহোৎ-সব ও ভূরিভোজনের ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, ইহা বুঝি পিতৃপুরুষের

প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন নহে, বরং উত্তরাধিকারে অর্থপ্রাপ্তিহেতু মহান্ আনন্দোৎসব! শ্রীরামচন্দ্র যখন পিতৃশ্রাদ্ধ করেন, তখন তিনি কয়েকজন ঋষিকে নিমন্ত্রণ করেন। জনকতনয়া সীতা অন্ন লইয়া পরিবেষণ করিতে আসিয়া সহসা পলাইয়া গেলেন। অগত্যা শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং পরিবেষণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। পরে রামচন্দ্র সীতাদেবীকে এই ভাবে পলায়ন করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সীতাদেবী বলিলেন, 'পিতা তব ময়া দৃষ্টো ব্রাহ্মণাগ্রেষু রাঘব'। এ অবস্থায় আমি কিরূপে বল্কল পরিয়া তাঁহার সম্মুখে যাইব? আর আমি কিরূপে তাঁহাকে এই কদর্য্য অন্ন তৃণপাত্রে অর্পণ করিব?

যাহং রাজ্ঞা পুরা দৃষ্টা সর্ব্বাভরণভূষিতা।
সা স্বেদমলদিগ্ধাঙ্গী কথং যাস্যামি ভূপতিম্।
অপকৃষ্টাস্মি তেনাহং ত্রপয়া রঘুনন্দন॥

গরুড়পুরাণ উত্তরখণ্ড, ১১শ অধ্যায়।

মনুষ্যগণ ভূতলে যে অন্ন দেয়, তাহাতে প্রেত তৃপ্ত হয়; নিষ্পীড়িত বস্ত্রোদকে বায়বীয় দেহপ্রাপ্ত জীব, গন্ধ ও জলদ্বারা দেবগণ তৃপ্ত হন্।

শ্রাদ্ধ ও তর্পণ নিত্যকরণীয়। এতদ্ব্যতীত পর্ব্ব পর্ব্বে অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। ইহাকে অন্বাহার্য্য শ্রাদ্ধ বলিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অষ্টকা শ্রাদ্ধ আছে; বিশেষ বিশেষ শুভযোগে পিতৃশ্রাদ্ধ করণীয়। তীর্থে গমন করিলে তথায় পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি করিতে হয়। অমাবস্যায় পিতৃগণ গৃহীর দ্বারে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভ্রমণ করেন; ঐ সময়ে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা তৃপ্ত না হইলে তাঁহারা কুপিত হইয়া ফিরিয়া যান।

অমাবস্যা-দিনে প্রাপ্তে গৃহদ্বারে সমাশ্রিতাঃ।
বায়ুভূতাঃ প্রবাঞ্ছন্তি শ্রাদ্ধং পিতৃগণা নৃণাম্॥

যাবদস্তময়ং ভানোঃ ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলাঃ।
ততশ্চাস্তং গতে সূর্য্যে নিরাশা দুঃখসংযুতাঃ॥
নিশ্বসন্তশ্চিরং যান্তি গর্হয়ন্তস্তু বংশজম্।
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং চরেদ্ভক্ত্যা শাকৈরপি যথাবিধি॥

শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; প্রত্যহ পিতৃগণের স্মরণ ও বন্দন এবং তাঁহাদের প্রীত্যর্থে কথঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ বা দ্রব্যনিবেদন, ইহা শাস্ত্রকারগণ বিধিবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের মহনীয়তার পরিচয় দেন নাই কি? কিছু না পারি, অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া পিতরস্তৃপ্যন্তাম্ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্ পিতৃস্তৃপ্যন্তাম্ বলিয়া কি আমরা পিতৃগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারি না? শ্রাদ্ধ দ্রব্যপ্রধান নহে—ইহা ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-প্রধান। আমরা মাসে মাসে শ্রাদ্ধ করিতে না পারি; কিন্তু পিতৃনির্য্যাণ দিবসে বা মহালয়ায় তাঁহাদের তৃপ্তি-সাধনের জন্য সামান্য ক্লেশ বা ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি না কি? কি দুঃখে মাতাপিতা আমাদের প্রতিপালন করিয়াছেন তাহা বলিয়া দিতে হইবে কি? একবার 'পিতৃষোড়শী' ও 'মাতৃষোড়শী' পড়িয়া দেখিবেন চক্ষু জলে ভরিয়া যায় কি না? সত্যই—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

দশম পরিচ্ছেদ

শৌচ

আজকাল সুনীতি, সুশিক্ষা বা সদাচার আইন করিয়া শিক্ষা দিতে হয়। রাস্তায় যাইতে কে বামদিক দিয়া যাইবে, গাড়ী চলা পথ ছাড়িয়া কোথায় পাওট পথে (foot path) হাঁটিতে হইবে, যথা তথায় লোকে মলমূত্রনিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে পারিবে না—এই সকলের জন্য আইন বাঁধিয়া দেওয়া হয়। আইন অমান্য করিলে দণ্ডভোগ করিতে হয়। সনাতন ধর্ম্মে কোন কর্ম্মই ধর্ম্মানুশাসনের বহির্ভূত নহে—এই সকল বিষয়ে ধর্ম্মানুশাসনদ্বারা তাঁহারা সমাজের মহদুপকার করিতেন এবং ঐ সকল নীতি বংশপরম্পরা আচরিত হইয়া দৃঢ় সংস্কারে পরিণত হইয়া যাইত। কেহ কেহ বলেন, অতিরিক্ত ধর্ম্মভাব হিন্দুর অবনতির কারণ, একথা ভুল। হিন্দু ধর্ম্ম ভুলিয়াই পতিত হইয়াছে। স্বধর্ম্ম আচরণই পরম শ্রেয়ঃপ্রদ—এই স্বধর্ম্ম ভুলিয়া হিন্দু অধঃপতিত হইয়াছে। এক্ষণে শৌচাশৌচের অনুশাসন দেখাইয়া আমরা হিন্দুধর্ম্মের সূক্ষ্মশিক্ষার বিষয় আলোচনা করিব।

শৌচ সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মে অতিরিক্ত বিধিনিষেধ দেখা যায়—এই 'শৌচের' আতিশয্য দেখিয়া কোন কোন নব্য সংস্কারক 'ছুঁৎমার্গ' বা শুচিবায়ু বলিয়া শৌচাচারের যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। যে কোন বিষয়ে হাস্যজনক আতিশয্য 'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্' বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া সত্য বা তথ্য কোন সময়ে নিন্দার যোগ্য নহে। শরীর মনঃ ও আত্মা এই তিনটী বিষয় লইয়া আমাদের কার্য্য,

এই তিনটী বস্তু শুদ্ধ ও স্বাস্থ্যবান্ থাকিলে সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি ও কল্যাণ ঘটে। ক্রম অনুসারে আধ্যাত্মিক শৌচ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের। আত্মা শুদ্ধ ও মুক্ত থাকিলে আর কোন বাহ্যশৌচের প্রয়োজন হয় না। আধ্যাত্মিক রাজ্যে উন্নতিলাভ করিতে হইলে এই শৌচের একান্ত প্রয়োজন। দেহের ও মনের শুচিতা না থাকিলে কোন প্রকার ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতিলাভ ঘটে না। শৌচ সদাচারের ভিত্তি। যাহার শৌচ নাই, তাহার কোন আচারও নাই। এই শৌচ দ্বারা স্বাস্থ্য, শ্রী, সৌন্দর্য্য, আরোগ্য, আয়ুঃ ও কল্যাণ লাভ হয়।

দেহের সহিত মনঃ ও আত্মার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট—প্রায় সকল লোকের পক্ষে ইহার মধ্যে একের প্রভাব অন্যের উপর পড়িয়া থাকে। দেহ শুদ্ধ ও পবিত্র থাকিলে মনেরও পবিত্রতা ঘটে। প্রথমতঃ দেহের কথা আলোচনা করা যাউক। দেহের প্রথম পবিত্রতাসাধক কর্ম্ম স্নান। নিত্যস্নান প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের অবশ্য করণীয় কর্ম্ম। স্নান না করিলে দেহের মল ও দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় না। অশুচিতা ও অপরিচ্ছন্নতা হিন্দুর পক্ষে পাপ। দেহ শ্রীভগবানের মন্দির—ইহা নিত্য মার্জ্জিত ও সংস্কৃত করিয়া তাঁহার বাসোপযোগী করিতে হইবে; গেহও তাঁহার আবাস; ইহাও সর্ব্বদা পরিস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। সুবেশ পরিধানে সৌমনস্যের সঞ্চার হইবে—তৃপ্ত ও তুষ্ট মনে যাহাই করিবে, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিবে। দেহে, গেহে, আহারে, বিহারে সর্ব্বত্রই শুচিতা ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ—অশুচি দ্রব্য, ব্যক্তি, ভাব, স্থান সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য—ইহা হিন্দুধর্ম্মের প্রধান কথা। মহর্ষি অত্রি শৌচের বর্ণনা এইভাবে করিয়াছেন—

> অভক্ষ্যপরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
> আচারেষু ব্যবস্থানং শৌচমিত্যভিধীয়তে ॥

অভক্ষ্যপরিহার, অনিন্দিতসংসর্গ ও আচারানুবর্ত্তিতা এই তিনটী শৌচের লক্ষণ। সুতরাং কেবল দেহশৌচই শুচিতার লক্ষণ নহে বরং বহুস্থলে তাহা ভোগবিলাসিতার বিকারমাত্র। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, শৌচই জীবনের উদ্দেশ্য নহে—ইহা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়মাত্র। স্নান জীবনের উদ্দেশ্য নহে—স্নান, ধর্ম্মকর্ম্ম, সন্ধ্যা ও উপাসনা দৈব ও পৈত্র-কার্য্যের প্রথম আরম্ভ মাত্র।

নৈর্ম্মল্যং ভাবশুদ্ধিশ্চ বিনা স্নানং ন বিদ্যতে।
তস্মান্মনো বিশুদ্ধ্যর্থং স্নানমাদৌ বিধীয়তে॥

কেবল দেহের আরামের জন্য যে স্নান তাহা আর্য্যজনোচিত নহে—তবে স্নানের আনুষঙ্গিক ফল দৈহিক সুখ। হিন্দুশাস্ত্রে নানাবিধ স্নানের ব্যবস্থা আছে—যথা বারুণস্নান (জলে স্নান), আগ্নেয় স্নান (ভস্মলেপের দ্বারা), মান্ত্রস্নান (আপোহিষ্ঠা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক) ; ইত্যাদি।

মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্তস্নানং প্রকীর্ত্তিতম্॥
আপোহিষ্ঠাদিভির্মান্ত্রং ভৌমং দেহ প্রমার্জ্জনম্।
আগ্নেয়ং ভস্মনাস্নানং বায়ব্যং গোরজঃ স্মৃতম্॥
যত্তদাতপবর্ষেণ স্নানং দিব্যমিহোচ্যতে।
বারুণং চাবগাহঃ স্যান্মানসং বিষ্ণুচিন্তনম্॥

স্নান ও আচমন, ইহা প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বেই করণীয়। মুখ, চোখ, নাক, কাণ, বাহুমূল, হৃদয় ও নাভিতে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক জলস্পর্শ করাই আচমন। ইহার সহিত সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণু স্মরণ হিন্দুর প্রধানতঃ করণীয়। ঈশ্বরস্মরণ শুচিতার একমাত্র কারণ—সর্ব্বাপহারী শ্রীবিষ্ণুর

নাম সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে অবশ্য স্মরণীয়। দুই হাত, দুই পা ও মুখমণ্ডল, এই পঞ্চস্থান বাহির হইতে আসিয়া প্রথমতঃ মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য। আহারের পূর্ব্বে আচমন অবশ্য কর্ত্তব্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চবায়ু ও পঞ্চবায়ুর অধিদেবতা সূর্য্য, বায়ু বরুণ প্রভৃতির দেহের ভরণপোষণের সহায়ক কর্ম্মে অতি সুন্দর বিবরণ আছে। এই আচমনের দ্বারা বায়ুসকলের প্রীতি বল ও হিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও তাহাদের অধিদৈবতগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের পরম কল্যাণ করেন। এমন কি জড়বাদী শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন নাস্তিকগণ পর্য্যন্ত এই সকল নিয়ম স্বাস্থ্যের অনুকূল বলিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। আস্তিকবুদ্ধিসম্পন্ন আর্য্যসন্তানগণ এই সকল আচার দ্বারা স্বাস্থ্য ও আয়ুঃ ত' লাভ করেনই, অধিকন্তু দেবতার প্রসাদ লাভ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। নিত্যস্নান, সুবেশধারণ, গৃহাদি সুমার্জ্জিত রাখা, অশুচিবস্তু দূরে পরিহার, অশুচিস্পর্শ ত্যাগ, ইহাই বাহ্য শৌচ বা শারীর শৌচ।

বাহ্যশৌচের দ্বিতীয় কথা আহারশৌচ। "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" —আহারশুদ্ধিদ্বারা ভাবশুদ্ধি হয়। এমন কতকগুলি খাদ্য আছে, যাহা আমাদের শরীরের পক্ষে উপকারী হইলেও তাহা রিপুকে উদ্দীপিত করে বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহা বর্জ্জনীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। শাস্ত্রে অন্নদোষই আয়ুঃক্ষয়ের একটী প্রধান কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সদাচারী হিন্দু ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য বিশেষভাবে আহারে শুচিতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। আহারশৌচের তিনটী লক্ষণ শাস্ত্রে লিখিত আছে—(১) অন্ন সাধুভাবে অর্জ্জিত হইবে (২) ইহা নিষিদ্ধ খাদ্য হইবে না (৩) ইহা স্পর্শাদি দোষে দুষ্ট হইবে না। অসাধুভাবে অর্জ্জিত অন্ন বিষবৎ ত্যাজ্য, চোরের অন্ন গ্রহণ করিবে না। সাধুভাবে অর্জ্জিত

হইলেও হিন্দু নিষিদ্ধ ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে পারে না। সাধুভাবে অর্জ্জিত ও বিহিত খাদ্য হইলেও ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন গ্রহণ করিবে না। ইহাই হিন্দুর সদাচার। লশুন, পলাণ্ডু, গৃঞ্জন, কবক ইহা ত্রিবর্ণের নিষিদ্ধ। সদ্যঃ-প্রসূত ও রজঃস্বলা গাভীর দুগ্ধ পান করিবে না। যাহাদের মাংস ভোজনে প্রবৃত্তি আছে, তাহারা দেবতা ও পিতৃগণকে তাহা নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিবে। নচেৎ নিহত পশুর যত লোম, তত কোটী বর্ষ নরকভোগ করিতে হয়। বেদবিহিত হিংসাকে হিংসা বলিয়া ধরিবে না। কেন না ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিচারে বেদই প্রমাণ। যিনি শাস্ত্রবিধি ত্যাগপূর্ব্বক পিশাচবৎ মাংসভক্ষণ না করেন, তিনি লোকসমাজে প্রিয় হ'ন এবং ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হন না (মনু ৫।৫০)। পশুবধের অনুমতিদাতা, পশুহন্তা, মাংসবিভাগকারী, পাচক, পরিবেশক, খাদক সকলেই পশুহত্যাপাপে লিপ্ত হয় (মনু ৫।৫১)। ভগবান্ মনু মাংসের নিরুক্তি এইভাবে বর্ণনা করিতেছেন—

মাংসভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

ইহলোকে যাহাকে ভোজন করিতেছি, পরলোকে মাং (আমাকে) সঃ (সে) খাইবে—ইহাই 'মাংস' কথার নিরুক্তি। মদ্য-মাংসসেবায় মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—এই প্রবৃত্তির সঙ্কোচের জন্য শাস্ত্রে বিধি-নিষেধের এত প্রাবল্য। শাস্ত্র প্রবৃত্তিকে প্রশান্ত করিয়া মনোবৃত্তিকে নিবৃত্তিমুখী করিবার জন্য এই সকল নিষেধ করিয়াছেন এবং প্রবৃত্তির দেবতাকে নিবেদন পূর্ব্বক ত্যাগের সহিত ভোগের বিধান দিয়াছেন। শাস্ত্রের উপদেশ—নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

দ্রব্য, কাল, স্থান ও পাত্র এই চারিটী বিষয় লইয়া শুদ্ধাশুদ্ধির

বিচার। দ্রব্যশুদ্ধির নিয়ম অতি সাধারণ ও সহজ—জল, অগ্নি, লেপ, লেখন, মার্জ্জন, নির্ম্মলীকরণ দ্রব্যযোগাদির দ্বারা অনায়াসে দ্রব্য শুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা সাধারণ বুদ্ধির কথা—এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কিন্তু কালশুদ্ধি হিন্দুধর্ম্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য। কালের শুদ্ধি গ্রহনক্ষত্রের দ্বারা সূচিত হয়। সামান্ত আহার বিহার হইতে তীর্থযজ্ঞ, তপ, ব্রত পর্য্যন্ত সকলই শুদ্ধ কালে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। ফলের দিক দিয়া দেখিতে গেলে কালের প্রাবল্য অবশ্য স্বীকার্য্য। অকালে বীজ উপ্ত হইলে ফল প্রদান করে না—ইহা যেরূপ ভৌতিকরাজ্যের নিয়ম—মন্ত্রাদিও সেইরূপ যথাকালে যথোপযুক্তভাবে প্রযুক্ত না হইলে ফলপ্রসূ হয় না। কালের মহিমা অসীম। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর নিকট ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জলের ন্যায় পঞ্জিকাও অত্যাবশ্যক বস্তু। হিন্দুর অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের নির্ণায়ক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং এইজন্য জ্যোতিষশাস্ত্র বেদাঙ্গরূপে কল্পিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শুভকাল থাকিলেও সপিণ্ডের জন্ম ও মৃত্যুদ্বারা ব্যক্তির কালাশৌচ থাকে। আত্মীয়ের মরণে অন্তঃকরণে যে শোকের ছায়া পড়ে, তাহার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিই ধর্ম্মকর্ম্মকরণে কিছুদিনের জন্য অসমর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্ণ ও মৃত বা জাতব্যক্তির সম্বন্ধের দূরত্ব বা নৈকট্যানুসারে কালাশৌচ বিচার করা হইয়া থাকে।

কালের পর শৌচবিচারে স্থানের কথা আসে। তীর্থ, গোগৃহ, তুলসী ও বিল্বমূল, দেবস্থান, গুরুগৃহ, নির্জ্জনস্থান, গঙ্গাতট প্রভৃতি স্থান বিশেষভাবে পুণ্যদায়ক।

গোশালা বৈ গুরোগৃহং দেবায়তনকাননম্।
পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং সদাপূতং প্রকীর্ত্তিম॥

যে সকল স্থান সাধুসমাগমে বা সিদ্ধমহাপুরুষের সাধনায় পবিত্র হইয়াছে, সেই সকল স্থান বিশেষভাবে পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক। জনকোলাহল হইতে দূরে অবস্থিত উন্মুক্ত প্রকৃতির উৎসঙ্গে সহজেই আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ ঘটিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? ধর্ম্ম-সাধনায় 'অরতির্জনসংসদি' একটি প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে পরি-গণিত। অসাধুসেবিত, নাস্তিকবহুল, অনার্য্যপূর্ণ স্থান সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

স্থান কাল ও দ্রব্যশুদ্ধির যেমন প্রয়োজন—সেইরূপ মন্ত্রশুদ্ধি ও পাত্রেরও শুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। সংসারে যে কোন ব্যাপারে অর্জ্জিত দ্রব্য ন্যায়ভাবে অর্জ্জিত হইবে। নচেৎ ঐ বস্তুর দ্বারা উপকার না হইয়া অপকার হইয়া ঘটিবে। অপহৃত পদার্থ অপরকে দান করিলে দাতার পুণ্য হয় না; কিন্তু বস্তুর প্রকৃত অধিকারীরর পুণ্য ঘটে। অন্যায়োপার্জ্জিত দ্রব্য সর্ব্বদা অশুদ্ধ, তাহা দ্বারা কোন ধর্ম্মকর্ম্ম হইতে পারে না—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

যে সকল বিষয় লইয়া এতাবৎকাল বিচার করা গেল এই সকলই বাহ্য। আন্তর শৌচই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। শৌচাশৌচ বিচারে কতি-পয় জাতি জন্মাশুচি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের স্পর্শ সর্ব্বত্র নিন্দিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের অস্পৃশ্য-সমস্যায় এই বিধান লইয়াই মহান্ অনর্থের সৃষ্টি ঘটিয়াছে। যাঁহারা জন্মাশুচির কথা স্বীকার করেন না, তাঁহারা জন্মান্তর বা কর্ম্মবাদ স্বীকার করেন না। এইরূপ নাস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন লোক হিন্দু হইতে পারে না। এই বিষয়ে দার্শনিক সূত্র "সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ"। লোকের জাতি (জন্ম) আয়ু, ভোগ, তাহার কর্ম্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—সুতরাং চণ্ডালত্ব ও বিপ্রত্ব কর্ম্মফল। অতএব এ বিষয়ে দম্ভসহকারে শাস্ত্রদ্রোহ,

সমাজদ্রোহ না করিয়া মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করা উচিত যে বহু কুকর্ম্মফলে এই জন্মে এই শূদত্ব লাভ করিয়াছি; তথাপি ভাগ্যবলে সেই বিরাট্‌পুরুষের অঙ্গীভূত ও পাদোদ্ভব আর্য্যসন্তান আমি! আমার এই সুপ্রসন্ন অদৃষ্টবশতঃ আমি ভক্তি ও বিনয়দ্বারা শ্রীভগবানের প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক উত্তমা গতি লাভ করিব। অস্পৃশ্যতা মোচনের একমাত্র পন্থা এই ভক্তিযোগাবলম্বন—এই তপস্যা ব্যতীত অস্পৃশ্যতা-মোচনের অন্য পথ নাই। কারণ শাস্ত্রই বলিয়াছেন—

স কথং ব্রাহ্মণো যস্তু হরিভক্তিবিবর্জ্জিতঃ।
স কথং শ্বপচো যস্তু ভগবদ্ভক্তিমানসঃ॥
স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তম।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥

শাস্ত্র পক্ষপাত দুষ্ট নহেন, বরং অধিকারের অনুরূপ ব্যবহার করিয়া অপার করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাহিরের শৌচ আন্তরিক শৌচের প্রাথমিক অবস্থা মাত্র। এই আন্তরশৌচ আসিলেই তবে প্রকৃত শুচিতা আসে। আন্তরশৌচ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন, "স্নানং মনোমলত্যাগঃ শৌচমিন্দ্রিয়সংযমঃ।" সুতরাং মনের মলত্যাগ হইতেছে 'অহং' বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন। 'আমি' 'আমার' ত্যাগ না করিলে কোনমতেই চিত্তশুদ্ধি বা ভাবশুদ্ধি ঘটিতে পারে না। ভাবশুদ্ধি ব্যতীত সাধনা নিষ্ফল। যাহার অন্তর শুদ্ধ হয় নাই—সে কোটীবার গঙ্গাস্নান করিলেও তাহাতে স্নানের কোন ফল নাই। দম্ভ, দর্প, তমঃ প্রভৃতি ত্যাগই আন্তরশৌচ। আন্তরশৌচের কয়েকটি লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইতেছে:—

১। সত্য ও সারল্যের আশ্রয়—সর্ব্বদা সত্যকথা বলিবে; কদাচ

মিথ্যার আশ্রয় লইবে না। সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপস্যা সত্যই জ্ঞান—সমস্ত বস্তু সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

"নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ নানৃতাৎ পাতকং পরম্"

পুনশ্চ—

সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনাঃ ক্রিয়াঃ মোঘাঃ সত্যাৎ পরতরং নহি॥

ভগবান্ মনু ও বলিতেছেন—

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥

২। অহং ভাবের বর্জ্জন—'আমি' 'আমার' বুদ্ধি ত্যাগপূর্ব্বক সমস্তই ভগবদর্পণ। এই অহং ভাবের নাশের সহিত আত্মসমর্পণ ভাবশুদ্ধির প্রথম কারণ। অত্র শরণাগতিযোগই একান্ত অবলম্বনীয়। শরণাগতির ছয়টি অঙ্গ—প্রথমতঃ যাহা ভক্তির বৃদ্ধিকারক তাহাই কর্ত্তব্য—ইহাই অনুকূলস্য সঙ্কল্পঃ। দ্বিতীয়তঃ প্রতিকূলের বর্জ্জন অর্থাৎ যাহা সাধনবিরোধী বা ভক্তির প্রতিকূল তাহার বর্জ্জন—এ বিষয়ে মনই বড় শত্রু ; কেন না ইহা ইষ্টে অনিষ্ট এবং অনিষ্টে ইষ্ট দেখে সুতরাং 'মনকা কহনা কভি নেহি শুন্না (বিশ্বাস কর' না চিতে, বিপরীত দেখে হতে)। দ্বিতীয় কথা 'প্রতিকূলস্য বর্জ্জনম্।' তৃতীয়তঃ 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ', তিনি আমায় রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস। আমি ত' সামান্য লোক নই—আমি রাজরাজেশ্বরীর পুত্র। তিনি আমার কল্যাণ করিবেন ; জননী যেমন শিশুকে রক্ষা করেন, পিতা যেমন পুত্রকে দেখেন, তিনি আমাকে সেইরূপ রক্ষা করিবেন। এই বিশ্বাস। চতুর্থতঃ—'গোপ্তৃত্বে বরণম্।" হে অশরণের শরণ, অনাথের নাথ

তুমি আমায় রক্ষা করিও। তুমি আমার গুরু, পিতামাতা, সখা, সুহৃদ, প্রাণকান্ত, আমি তোমার, আমি তোমার, তুমি আমায় রক্ষা করিও। কবীরের ভাবায়—

মৈ গোলাম মৈ গোলাম্ মৈ গোলাম তেরা
তুঁ দেওয়ান্ তুঁ দেওয়ান্ তুঁ দেওয়ান্ মেরা।

বা যো কুছ্ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।

অথবা ত্বং গতিস্ত্বং মতির্ম্মহ্যং পিতামাতা গুরুঃ সখা
সুহৃদশ্চাত্মরূপস্ত্বং ত্বাং বিনা নাস্তি মে গতিঃ॥

চতুর্থতঃ, আত্মনিক্ষেপ—আমি সমস্ত তোমার চরণে দিলাম,—

তিল তুলসী সহ দেহ সমর্পিনু
দয়া জনি ছোড়বি মোয়।

অথবা 'তনু মন দিয়া সব সমর্পিয়া চরণে হইনু দাসী' ইহাই আত্মনিক্ষেপ এবং পরিশেষে কার্পণ্য—আমি কিছু নই—আমি অজ্ঞান, জড়মতি কোলের শিশু; মা আমায় রক্ষা করিও। তুমি আমায় যেমন বলাও, তেমনি বলি, যেমন চালাও, তেমনি চলি, তুমি যেমন করাও তেমনি করি—যো কুছ হ্যায়, সব তুঁহি হ্যায়। অথবা শ্রীচৈতন্যের ভাষায়—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

এই শরণাগতির সহিত দর্পদম্ভ অহং মম ত্যাগ—ইহাই আত্মশুদ্ধির দ্বিতীয় কথা। দর্পদম্ভ অহঙ্কার—ইহা আসুরভাব এবং তমোগুণোদ্ভুত। দর্পণে মল পুঞ্জীকৃত হইলে যেমন তাহার উপর প্রতিবিম্ব

পড়ে না—সেইরূপ মনের মধ্যে দর্পদম্ভ থাকিলে সত্যদর্শন ঘটে না। এই আসুরভাব ভাবশুদ্ধির প্রধান অন্তরায়। *

৩। শম (মনের নিগ্রহ), দম (ইন্দ্রিয় সংযম), উপরতি (বিষয় বৈরাগ্য), তিতিক্ষা (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা), সমাধান (অনুকূল বিষয়ে মনঃসংযোগ), ও শ্রদ্ধা (শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যে বিশ্বাস)—এই ষট্‌যম্পত্তি।

৪। আহারশুদ্ধি, বাক্‌শুদ্ধি ও কায়শুদ্ধি—অর্থাৎ নিষিদ্ধভক্ষ্য বর্জ্জন, সত্য, প্রিয়, হিত ও সরল বাক্য কথন, সর্ব্বদা শুচি থাকা ও পবিত্র বেশ পরিধান।

মন্ত্রযোগ সংহিতায় গীতার প্রতিধ্বনি করিয়া কথিত হইয়াছে—

"অভয়ংসত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্।
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদো দৈব্যাশ্চিত্তনৈর্ম্মল্যকারণম্॥

অর্থাৎ ভয়শূন্যতা, চিত্তপ্রসন্নতা জ্ঞানযোগে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভের উপায় সমূহে তীব্র নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, বেদ ও বেদ সম্মত শাস্ত্র সমূহের পাঠ, তপঃ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, কর্ম্মফলে অনাসক্তি, চিত্তশান্তি, খলবৃত্তি সমূহের ত্যাগ, ভূতদয়া, নির্লোভতা,

---

* যথা সূর্য্যোদয়ে জাতে তমোরূপং ন তিষ্ঠতি।
অহঙ্কারাঙ্কুরস্যাগ্রে তথা পুণ্যং ন তিষ্ঠতি।
দেবী ভাগবত। ৪।৭।২৫

নিরহঙ্কারিতা, কুকর্ম্মে লজ্জাবোধ, অচাঞ্চল্য, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, নির্বিরোধ, অনভিমানিতা, অর্থাৎ আমি পূজ্য, আমি বড়, আমি যোগ্য, ইত্যাদি প্রকার মাৎসর্য্য ভাবসমূহের ত্যাগ, এই সকলকে দৈবী সম্পত্তি বলে। এই সকল বৃত্তির অভ্যাসদ্বারা অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়।"

—মন্ত্রযোগ সংহিতা।

ভাবশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধিই প্রকৃত শৌচ। এই শৌচ না থাকিলে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। "ভাবদুষ্টস্তথা তীর্থে কোটীস্নাতো ন শুধ্যতি"—যে ভাবদুষ্ট, সে তীর্থে কোটীবার স্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না। আর—

মনোবাক্কায় শুদ্ধানাং রাজংস্তীর্থং পদে পদে॥

—দেবী ভাগবত ৪।৮।২৮

একাদশ পরিচ্ছেদ

আচার

সনাতনধর্ম্মে আচারই পরমধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম এরূপ বিরাট্ ও ব্যাপক যে ইহার একটা সাধারণ সংজ্ঞা নিরূপণ করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সদাচার হিন্দুধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ, একথা বলিলে আদৌ অতিরঞ্জন হয় না। সদাচার ভিন্ন ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
অস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥

(মনু ১।১০৮)

পুনশ্চ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইতেছে—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥

সুতরাং আচার ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ বলিয়া কথিত হইতেছে। আচারবিচ্যুত ধর্ম্মচ্যুত হ'ন এবং আচারবান্ শীঘ্রই ধর্ম্মলাভ করিতে পারেন। আচারহীন ব্যক্তি ধর্ম্মহীন ও নাস্তিক বলিয়া সর্ব্বত্র নিন্দিত হইয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম্মে কিভাবে জীবনযাপন করিতে হইবে, ইহার যে প্রণালীবদ্ধ বিধি, তাহাই আচার। এই আচারধর্ম্ম দ্বারা ইংরাজীতে যাহাকে Conduct of life বলা যায়, তাহাই বুঝায়। সমগ্র জীবন কি প্রণালীতে বাহিয়া গন্তব্যস্থলে যাইতে হইবে, এই আচারধর্ম্মে

তাহারই নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। আমাদের মন স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি-পরায়ণ মন কিরূপে নিবৃত্তির দিকে লইয়া যাওয়া যায়, তাহার সরল ব্যবস্থা আচার, আচারের প্রাণ সংযম—সমস্ত আচারই সংযমশিক্ষা দিয়া থাকে। যথেচ্ছ আহার, যথেচ্ছ বিহার, সন্ধ্যাবন্দনা ত্যাগ, আলস্য, মূর্খতা, অসৎসঙ্গ, অপবিত্র সংস্পর্শ প্রভৃতি পরিহারের জন্য সদা-শয় ঋষিগণ সদাচারমূলক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাই আচারের নিষেধপ্রধান রূপ (negative aspect)। অপরদিকে মাতাপিতার সেবা, ভ্রাতৃপ্রেম, গুরুজনগণের সম্মান, আর্ত্তের দুঃখবিমোচন, শ্রাদ্ধ তর্পণ, ভূতবলি, উপাসনা প্রভৃতির সমর্থন করিয়া সদাচার আমাদিগকে আধ্যাত্মিকশক্তি বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করে। ইহাই আচারের বিধিপ্রধান রূপ (positive aspect)। এইরূপ নানাবিধি ও নিষেধের দ্বারা আচার আমাদিগের শরীর ও মনের পরম কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। আচারহীনতা দ্বারা মানব দুঃখ কষ্ট, রোগ, শোক ও অকালমৃত্যু ডাকিয়া আনে।

মহর্ষি মনু বলিতেছেন—

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ॥
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥

বেদ অভ্যাস না করিলে, সদাচার পরিত্যাগ করিলে, কর্ত্তব্যকর্ম্মে অলস লইলে ও দূষিত অন্নভোজন করিলে মৃত্যু ব্রাহ্মণগণের প্রাণহিংসা করিয়া থাকেন। সত্যকথা বলিতে কি, এ যুগে রোগ ও অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ অনাচার। বর্ত্তমান যুগে আচারের বিরুদ্ধে অভিযান যেন যুগধর্ম্মের একটা প্রধান লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই অভিযান-কারীরা একবারও স্মরণ করেন না যে এই আচার পরম কল্যাণের

নিদান। একবার কোন স্থানে আমরা দলবদ্ধ হইয়া যাইতেছিলাম, এই সময় দারুণ গ্রীষ্ম। আমি অঞ্জলি পাতিয়া কলের জল পান করিতে-ছিলাম দেখিয়া আমার কোন বিজ্ঞবন্ধু আমায় যথেষ্ট নিন্দা ও উপহাস করিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম,—"তুমি আমায় উপহাস করিতেছ, আমি তোমায় দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। একটী কাঁচ পাত্রে একটী কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া সকলকে সেই পাত্রে জল দেওয়া হইতেছে। তুমি অমুককে সেই পাত্রে জল খাইতে দেখিয়াছ ?

বন্ধু বলিলেন,—"হুঁ"।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম'—"সে কি রোগী ?

বন্ধু—"যক্ষ্মা"

আমি—"বেশ, আর একজন, নাম অমুক, সে জল খাইয়াছে ; সে কি রোগী ?"

বন্ধু—"কুষ্ঠ"

আমি—"ভাল, এখন বলত' তোমার ঐ পাত্রে জলপান করা উচিত ? তোমার প্রবৃত্তিই বা কিরূপে হইল ? এখন বলত, হিন্দুয়ানীটা গোঁড়ামী না ন্যাকামী ?"

তখন বন্ধুর চক্ষু ফুটিল ; তিনি বলিবেন,—"তুমিই ঠিক বলিয়াছ।"

আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ শয়নাৎ সহভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসা ॥

আমরা ডাক্তারি 'শুচিবায়ু' মানি, কেন না তাহা পশ্চিমের আম-দানি ; কিন্তু শাস্ত্রীয় শৌচাচার মানিনা, কেন না তাহা আমাদের স্বধর্ম্ম ও স্বকীয় বস্তু। ধন্য আমাদের দেশাত্মবোধ! ধন্য আমাদের স্বাদেশিকতা! আমাদের অস্থিমজ্জায়, শিরায় শিরায় এই বৈদেশিক

মোহ প্রবিষ্ট হইয়াছে ; আমরা স্বরাজ, স্বরাজ করিয়া চীৎকার করিলে কি ফল হইবে ?

বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব যে সদাচারগুলি আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের নিদান-স্বরূপ। আচার অর্থহীন কুসংস্কার মাত্র এবং ইহা অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলিয়া নব্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত। মোট কথা, আচার পালনে যে সংযম ও ক্লেশস্বীকার করিতে হয়, তাহা এই সকল লোক করিতে অনিচ্ছুক এবং এইরূপে নিজেরা অনাচারী হওয়ায় লাঙ্গুলহীন শৃগালের ন্যায় ইঁহারা আচারধর্ম্মের অনাবশ্যকতা প্রচার করিয়া থাকেন। শাস্ত্র-বিহিত নিয়মপালন ও বর্ণাশ্রম সম্মত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনই সদাচার। আমরা কাহাকে সদাচারী বলি ? যিনি শাস্ত্রসম্মতভাবে জীবন যাপন করেন তিনিই সদাচারী। যিনি প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যাবন্দন, অভক্ষ্যবর্জ্জন, শৌচধর্ম্মপালন, ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থোপার্জ্জন করেন ও শান্ত, দান্ত, এবং পবিত্র থাকিবার চেষ্টা করেন, তিনি সদাচারী। সদাচারের প্রথম নিয়ম—

শৌচধর্ম্ম পালন—(১) আহারশৌচ
(২) উপার্জ্জনশৌচ
(৩) ভাবশৌচ

সদাচরী ব্যক্তি অভক্ষ্য বা নিষিদ্ধ ভক্ষ্য সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবেন এবং অস্থানে ও বিভিন্ন জাতির অন্ন বা দূষিত অন্ন গ্রহণ করিবেন না এই-রূপে তিনি আহারশৌচদ্বারা লোভশূন্যতা ও সংযমশিক্ষা করিবেন ও ক্ষুত্তৃষ্ণা জয় করিতেও সামান্যতঃ সমর্থ হইবেন। আহারশৌচাবলম্বনে স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম উভয়ই লাভ করিবেন। কেহ কেহ বলেন আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই, আহার রুচিগত ; যাদৃশী প্রবৃত্তি ও

রুচি তদনুযায়ী লোকে আহার করিবে। এ কথা সম্পূর্ণতঃ ভুল—প্রবৃত্তির সঙ্কোচই আচারের উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রবৃত্তির অনুযায়ী আহার কদাচ শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না। শাস্ত্রের অবিরোধে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা যায়, কিন্তু শাস্ত্রবিরোধী প্রবৃত্তি সর্ব্বনাশের মূল। আহার ও আচার একই কথা। রুগ্ন বালক যদি প্রবৃত্তির বশে অপথ্য সেবন করিতে চাহে, তাহাকে যেমন নিবারণ করা হয়, সেইরূপ বিধি ও নিষেধের দ্বারা শাস্ত্রও ধর্ম্মানুকূল আহারের বিধান করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যদি বিজাতি বা বিধর্ম্মী পূত ও পরিচ্ছন্ন হয়, তাহার হাতে খাইতে দোষ কি? ইহার উত্তর তর্ক বা যুক্তি করিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। বাহিরের পরিচ্ছন্নতার দ্বারা ভিতরের পবিত্রতা বুঝা যায় না—ইহা প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা—এই প্রথা যখন শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তখন এইরূপ কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ—ইহার ফল পাতিত্য। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর পক্ষে শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন মহাপাপ। কেহ কেহ মনে করেন এই সকল আচারপালন বিশেষ অসুবিধাজনক; কিন্তু এ বিষয়ে উপায় কি? মনুষ্যত্বের জন্য যে সারা জীবন ত্যাগ ও সাধনার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে; অসুবিধা বা ক্লেশস্বীকার না করিলে কি ধর্ম্ম রক্ষা হয়? এই দেশের দারুণ গ্রীষ্মে ইংরেজগণ কখন ত' মিহি পাঞ্জাবী পরিধান করেন না—কারণ তাহা তাঁহাদের দেশাচারসম্মত নহে। আর অসুবিধা বলিয়া কি আমরা আচার ব্যবহার বর্জ্জন করিব? সদাচারী ব্যক্তি সর্ব্বদাই শৌচধর্ম্মপরায়ণ হ'ন এবং এক শুচিতার জন্য তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ধর্ম্মভাবপূর্ণ থাকে। সুতরাং আহারশুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল সত্ত্বশুদ্ধি বা ভাবশুদ্ধি। এইরূপ আহারপূত ও ভাবশুদ্ধ লোক কদাচ অধর্ম্মদ্বারা অর্থার্জ্জন করিতে পারেন না।

সদাচারীর দ্বিতীয় লক্ষণ ঈশ্বরপরায়ণতা। নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনা

সদাচারের মধ্যে গণ্য। যে দ্বিজ সন্ধ্যাবর্জ্জিত সে বর্ণবর্জ্জিতও বটে। এইরূপ অহরহ সন্ধ্যাবন্দনায় তাঁহার মন নির্ম্মল ও উদার হইতে থাকে; ফলে তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিশেষভাবে অবহিত হন ও সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করেন। সদাচরী দেব, ঋষি ও পিতৃগণের পূজা করিয়া ইহামুত্র কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। সদাচারী হিন্দু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পুণ্যাহে ও পর্ব্বদিনে দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম অবশ্যই করিয়া থাকেন। পিতৃপক্ষে তর্পণ মহালয়ায় শ্রাদ্ধাদি এবং মাতাপিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ প্রত্যেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই সকল ক্রিয়াও সদাচারের অঙ্গীভূত।

সদাচারের তৃতীয় লক্ষণ সত্যপরায়ণতা ও সাধুতা।

সদাচারী কদাচ মিথ্যার আশ্রয় লন না। সত্য অপেক্ষা জগতে কিছুই বড় নাই ; সত্যই ধর্ম্ম , সত্যই স্বয়ং ভগবান্।

সত্যমেব পরং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানমনন্তকম্।
সত্যমেব পরা বেদাঃ ওঁকারঃ সত্যমেব চ ॥
সত্যং বেদেষু জাগর্ত্তি সত্যং চ পরমং পদম্।
সত্যং বিজয়তে লোকং সত্যরূপী জনার্দ্দনঃ ॥

সত্য বলিতে হইবে বলিয়া অপ্রিয়সত্য বলিবে না

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥—মনু ৪।১৩৮

ইহাই সনাতনী প্রথা। যিনি পূর্ণ সত্যবাদী হ'ন তিনি সিদ্ধবাক্ হইয়া থাকেন। অতিশয়োক্তি, ছল, কাপট্য প্রভৃতি সকলই মিথ্যাজাত। ভিতর ও বাহির এক রাখাই প্রকৃত সত্যপালন! বৃথা বাক্য কথন ও পরনিন্দা মিথ্যার আকর। সদাচারী ব্যক্তি স্বীয় দোষ দর্শন করেন এবং ভ্রমেও পরনিন্দা করেন না। পরনিন্দায় নিন্দিত ব্যক্তির দোষ

স্খালিত হইয়া নিন্দকের উপর বর্ত্তিয়া থাকে। কর্কশ বাক্য দ্বারা কদাপি কাহারও হৃদয়ে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। রূঢ় ভাষায় অপরের হৃদয়ে ব্যথা দিলে কখনই আপনার কল্যাণ হইতে পারে না। সদাচারী সর্ব্বতোভাবে সত্যপরায়ণ ও সাধু হইবেন। পরের অনিষ্ট দ্বারা আপনার লাভ কখনই হইতে পারে না। প্রবঞ্চনা বা অসাধুতা সাক্ষাৎ অধর্ম্ম। প্রবঞ্চক, শঠ, ধূর্ত্ত ও বিড়ালব্রতীর ইহলোক ও পরলোক নষ্ট হইয়া থাকে।

সদাচারের চতুর্থ লক্ষণ দেব, দ্বিজ ও গুরুজনে ভক্তি। সদাচারী সর্ব্বদাই স্বীয় কর্ম্মে অবহিত থাকেন; তিনি কদাপি কর্ত্তব্যচ্যুত হ'ন না। এই সংসারচক্রের মূলে দৈবপ্রচেষ্টাই প্রধান; দেবকুল, ঋষিকুল ও পিতৃকুল সংসারের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি ও রক্ষা করিয়া থাকেন। নৈষ্ঠিক দেবপূজায় ও নিত্য উপাসনায় কদাচিৎ বিমুখ থাকিবেন না।

ব্রাহ্মণে ভক্তিশ্রদ্ধা হিন্দুধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। ব্রাহ্মণ ভূদেব ও জঙ্গমতীর্থ—ভূতলে ব্রাহ্মণ অবশ্যপূজ্য—

> উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
> স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
> ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
> ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥

যিনি যতই ব্রাহ্মণভক্তিসম্পন্ন হইবেন, তিনি ততই ব্রহ্মণ্যগুণসম্পন্ন হইবেন। ভক্তির যেরূপ আকর্ষণী শক্তি আছে, এরূপ আর কোন বস্তুর নাই। দেবভক্তি দ্বারা মানুষ দেবতা হয়—ব্রাহ্মণভক্তি দ্বারা মানব ব্রহ্মণ্যগুণসম্পন্ন হয়। ব্রহ্মণ্য বলিতে ব্রহ্মত্ব প্রাপক সত্ত্বগুণই বুঝায়; সুতরাং শূদ্রাদি জাতির ব্রাহ্মণভক্তি যে একান্ত কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ

নাই। যুগধর্ম্মে ব্রাহ্মণ পতিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, এবং ব্রাহ্মণের পতনে সর্ব্ববর্ণেরই অধঃপতন ঘটিয়াছে। মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে অন্য অঙ্গের কোন সার্থকতা থাকে না। ব্রাহ্মণের উত্থান ও উন্নতির উপর সনাতন ধর্ম্মের সমস্তই নির্ভর করিতেছে। এই ব্রাহ্মণভক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণের উন্নতি ও স্বকীয় আত্মারও ঊর্দ্ধগতি অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা ব্রাহ্মণবিদ্বেষী, তাঁহারা যেন আপনাদের বর্ণাশ্রমী সনাতনধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় না দেন। ভারত যতদিন ভারত, ব্রাহ্মণ ততদিন ব্রাহ্মণ। হিন্দুধর্ম্মের ন্যাসরক্ষক ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণদ্রোহ ধর্ম্মদ্রোহ ও আত্মদ্রোহের নামান্তর মাত্র। স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা, তিনি 'গোব্রাহ্মণহিতায়' নিযুক্ত আছেন—ইহা হিন্দুমাত্রেরই স্মরণীয়।

গুরু, মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মাতাপিতৃকল্পজন প্রভৃতির ভক্তি ও সেবা সদাচারের অঙ্গীভূত। জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আশ্রিত ও অতিথিবর্গের সেবা এবং আপ্যায়ন সকলই সদাচারের অন্তর্ভুক্ত। গুরু সাক্ষাৎ নারায়ণ—কায়মনোবাক্যে তদীয় চরণে আত্মসমর্পণ, হিন্দুধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান উপদেশ।

গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব পরা গতিঃ।
গুরুরেব পরা বিদ্যা গুরুরেব পরায়ণম্॥
গুরুরেব পরা কাষ্ঠা গুরুরেব পরং ধনম্॥

গুরুপদাশ্রয় ব্যতীত কোন মতেই জ্ঞান বা মুক্তি হইতে পারে না।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাঃ হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।

"যথা জাত্যন্ধস্ত রূপজ্ঞানং ন বিদ্যতে, তথা গুরূপদেশেন বিনা কল্পকোটিভিস্তত্ত্বজ্ঞানং ন বিদ্যতে।" সনাতন শাস্ত্রে গুরুসেবা, গুরুভক্তি, গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা একমাত্র মুক্তির পন্থা। যিনি আমাদের জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক করেন, তাঁহার সেবাভক্তি সদাচারের অন্তরঙ্গীভূত। কদাচ গুরুর অবাধ্য হইবে না বা গুরুনিন্দা করিবে না। যেস্থলে গুরুনিন্দা হয়, সে স্থল সেই মুহূর্ত্তে ত্যাগ করিবে। গুরুনিন্দার বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই সমভাবে পাপী। যাহার নিকট কোন বিষয় এবং এমন কি একটী অক্ষর পর্য্যন্ত শিক্ষা করা যায় তিনি পর্য্যন্ত গুরুবৎ মাননীয়।

মাতাপিতাও পরমগুরু। সদাচারী ব্যক্তি সর্ব্বদাই মাতৃপিতৃপূজাপর হইবেন। যাহাদের মাতাপিতা জীবিত আছেন, তাহারা প্রত্যহই তাঁহাদের পাদগ্রহণ ও প্রণাম করিবেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও পিতৃবৎ পূজ্য। নৈষ্ঠিক হিন্দু গুরুজনবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কনিষ্ঠদিগের প্রতি স্নেহ-সম্পন্ন হইবেন।

আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতা স্বো মূর্ত্তিরাত্মনঃ॥
আচার্য্যস্ত পিতা চৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্ব্বজঃ।
নার্ত্তেনাপমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ॥
যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্ত চ সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে॥
তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে।
ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ॥—মনু ২।২২৫—২২৯

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠকে পুত্রের ন্যায় পালন করিবেন এবং কনিষ্ঠভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃবৎ মান্য করিবেন (মনু ৯।১০৮)। কিন্তু যদি জ্যেষ্ঠ অন্যথাচরণ করেন, তবে তিনি বন্ধুবৎ (মাতুলাদিবৎ) অর্চ্চনীয় হইবেন। (মনু ৯।১১০)। ভ্রাতৃগণ একত্র বাস করিবেন, কিন্তু ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য পৃথক্ বাসই প্রশস্ত (মনু ৯।১১১)

আচারবান্ সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবেন, বিশেষতঃ বৃদ্ধবর্গকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবেন।

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপ.সবিনঃ।
চত্বারি সম্প্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যাযশোবলম্॥

স্বজাতীয় লোকদের মধ্যে ধন, সম্বন্ধ, বয়স, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাচরণ ও বিদ্যা বিচারপূর্ব্বক মর্য্যাদা করণীয়। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই সম্মানার্হ। কিন্তু যিনি ভক্ত ও জ্ঞানী (ব্রহ্মবিদ্) তিনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা পূজ্য—তাঁহার জাতিবিচার নাই ; ইহাই হিন্দুধর্ম্মের সিদ্ধান্ত।

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।

শ্রীভগবানের পর্ব্বানুমোদনও সদাচারের অঙ্গীভূত। একাদশীতে উপবাস, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের বিধেয়। এইভাবে জন্মাষ্টমী, রামনবমী, সীতানবমী, নৃসিংহচতুর্দ্দশী, মহাষ্টমী, মহানবমী, শিবচতুর্দ্দশী প্রভৃতি পুণ্যাহে ব্রতোপবাসাদি পবিত্রতাকারক, ধর্ম্মসঞ্চারক। কলিযুগে এই ক্লেশস্বীকারই তপস্যা। গাণপত্যগণ চতুর্থী, সৌরসম্প্রদায় সপ্তমী, শৈবগণ চতুর্দ্দশী, বৈষ্ণব একাদশী ও শাক্তগণ অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশীদিন বিশেষ ভাবে পালন করিবেন। ঐ সকল দিনে আমিষবর্জ্জন, স্তোত্র, শতনাম, বিশেষদেবের গীতা ও উপনিষদ্‌পাঠ ও বিশেষ মাহাত্ম্য পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিবেন। পুরাণপাঠে ঋষিসঙ্গ হয় এবং তাহাতে মনঃ পূত ও

ধর্ম্মোন্মুখ হইয়া থাকে। তীর্থ, ব্রত, কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সদাচারী হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থসঙ্গতি থাকিলে পূজাপাঠ প্রভৃতির ব্যবস্থা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ধর্ম্মার্থে অর্থব্যয় অপব্যয় নহে—অপর সকল ব্যয় নিতান্ত অপব্যয়—ইহা হিন্দুর বিশ্বাস।

সর্ব্বজীবে দয়া ও পরোপকারবৃত্তি সদাচারের অঙ্গীভূত। বাসুদেব ইতি সর্ব্বম্—ইহাই আমাদের সাধ্য। শ্রীশ্রীভাগবতের একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে সর্ব্বজীবে ভগবদ্দৃষ্টিই একমাত্র সহজ ও সুলভ পথ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। কোন জীবের প্রতি কোন মানব ঘৃণাদৃষ্টি করিবেন না, এমনকি কীট পতঙ্গকে পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিভূতি মনে করিবেন।

প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ আশ্বচাণ্ডালগোখরম্

দণ্ডবৎ হইয়া কুক্কুর, গরু, গর্দ্দভ, চণ্ডালকে প্রণাম করিবেন। সদাচারে স্পর্শাস্পর্শের বিচার থাকিলেও তাহাতে ঘৃণার অবসর নাই; অশুচি অবস্থায় আমার পুত্র অশুচি তাহা বলিয়া ঘৃণার পাত্র নহে,—ব্যবহার-দৃষ্টিতে চণ্ডাল অস্পৃশ্য হইলেও কদাপি ঘৃণ্য নহে। 'সর্ব্বে সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ'—ইহা আচারী হিন্দুর একান্ত প্রার্থনা। সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি করিতে হইবে, কিন্তু একাকার নহে। বাবা গম্ভীরনাথ বলি-তেন,—'সমদৃষ্টি করনা, সমতা নেহি।' আচারী হিন্দু অন্য জাতিকে ভালবাসিবে; তাহা বলিয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ একত্রভোজনাদি ব্যাপার কদাচ করিবে না। অধুনা যে সমতার প্রচার, তাহা নাস্তিক্যবুদ্ধিপ্রসূত —এ সকল ভাব সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। পরোপকার ধর্ম্ম আচারের প্রধান অঙ্গ—

পরদুঃখেন যো দুঃখী সুখী পরসুখেন চ।
সংসারে বর্ত্তমানোঽপি জ্ঞেয়ঃ সাক্ষাৎ হরিঃ স্বয়ম্॥

ভূতানাং দুঃখমগ্নানাং দুঃখোদ্ধর্ত্তা হি যো নরঃ।
স এব সুকৃতী লোকে জ্ঞেয়ো নারায়ণাংশজঃ॥
সন্তস্তে যেঽনিশং লোকে পরদুঃখনিসূদনাঃ।
আর্ত্তানামার্ত্তিনাশার্থং প্রাণাঃ যেষাং তৃণোপমাঃ॥
—ভক্তিকৌস্তুভঃ ২১ আ। ২

সদাচারী হিন্দু কদাচ কোন প্রাণীর হিংসা করিবেন না। প্রাণিহিংসা মহাপাপ।

যঃ প্রাণিহিংসকো মর্ত্ত্যঃ স এব হরিহিংসকঃ।
সর্ব্বপ্রাণিশরীরস্থো ভগবান্ জগদীশ্বরঃ॥
অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ অহিংসা পরমং শ্রুতম্।
অহিংসা পরমং সত্যং অহিংসা চ পরং সুখম্॥

ইন্দ্রিয় সংযমই সদাচারের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কথা—ইহাই সদাচারের প্রাণস্বরূপ। আহার-শৌচ, অহিংসা, পূজ্যপূজা, বচনসংযম প্রভৃতি সকল বিষয়ের মধ্যে স্বার্থত্যাগ সংযম বা অহমিকাবর্জ্জন এই গুলি রহিয়াছে। সংসারের মূলে অহঙ্কার, এই 'অহং' বর্জ্জনে জীবের মুক্তি; সদাচারে 'অহং' বিনষ্ট হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, মনঃ নির্ম্মল হয় এবং তখনই 'সদাচারাদখিলদুরিতক্ষয়ো ভবতি—তস্মাদন্তঃকরণ-মতিনির্ম্মলঃ ভবতি', তবেই মনে সদ্‌গুরুর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে এবং সদ্‌গুরুপ্রসাদে মুক্তি করতলগত আমলকবৎ হইয়া উঠে।

সকল সদাচারের মধ্যে এই ইন্দ্রিয়সংযমই প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্য ভাবে নিহিত। পর্ব্বাহে অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী অমাবস্যা বা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে যে স্ত্রী, তৈল, মৎস্য, মাংস সম্ভোগ নিষিদ্ধ ইহা কি প্রবৃত্তি-সঙ্কোচের বিধান নহে? বৃথামাংসভোজননিষেধে প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি

কি বাধাপ্রাপ্ত হইবে না? বৃদ্ধসেবায় কি 'অহং' সঙ্কুচিত হইবে না? এই সদাচার বা ইন্দ্রিয়সংযমই ধর্ম্মের মূল। যিনি দশ ইন্দ্রিয় ও মনঃ জয় করিয়াছেন, তিনি সকলই জয় করিয়াছেন—

শ্রুত্বা, স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

কেবল ইন্দ্রিয়দোষে সকল জ্ঞান ও পরমার্থ নষ্ট হইয়া যায়।

ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞাদৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥
বশীকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্॥

—মনু ২।৯৯—১০০

"চর্ম্মপাত্র বহুচ্ছিদ্রময় না হইলেও একটী ছিদ্রের দোষে যেমন জলপূর্ণ হইয়া মগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি একটী ইন্দ্রিয়ও স্খলিত হয়, তাহা হইলে সেই একটী ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্যেই পরমজ্ঞান নষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়সমূহকে আয়ত্ত রাখিয়া, মনকে সংযত করিয়া উপায়বলে দেহকে পীড়া না দিয়া লোকে সমুদায় পুরুষার্থই সাধন করিবে।"

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

যশ্চৈতান্ প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বান্ যশ্চৈতান্ কেবলাংস্ত্যজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্ব্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে॥

—মনু ২।৯ ৩ম

এই ইন্দ্রিয়জয় অতি কঠোর—তীব্রজ্ঞান, অভ্যাসদ্বারা মাত্র ইন্দ্রিয়জয় হইতে পারে। এই ইন্দ্রিয়জয়ের উদ্দেশ্যে ঋষিগণ অল্পমতি মানবের জন্য আচারধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

এই আচারই ধর্ম্মের প্রাণ—যাহার আচার নাই, সে সর্ব্বধর্ম্মবিচ্যুত—

আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তো সম্পূর্ণো ফলভাগ্ ভবেৎ॥
এবম্ আচারতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়ো গতিম্।
সর্ব্বস্য তপসঃ মূলমাচারঃ জগৃহুঃ পরম্॥

মনু ১। ১০৯—১১০

অর্থাৎ আচারবিচ্যুত ব্রাহ্মণ বেদফল পান না; আচারযুক্ত হইলে সম্পূর্ণ ফলভাগী হ'ন। মুনিগণ আচারের মধ্যেই ধর্ম্মপ্রাপ্তির উপায় দর্শন করিয়া তাহাকে তপস্যার মূল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিবদ্ধং স্বেষু কর্ম্মষু।
ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচারমতন্দ্রিতঃ॥
আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥
দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ॥
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥ মনু ৪।১৫৫—১৫৮

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নারীধর্ম্ম

সমগ্র বিশ্বে অধুনা নারীবিপ্লবের বিরাট্ প্লাবন উপস্থিত হইয়াছে, ইহা পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নূতন জগৎ আমেরিকার কথা ছাড়িয়া দিই—সেখানে স্ত্রীলোক কেবল ভগবান্‌কে ফাঁকি দিতে পারে নাই, নচেৎ সেস্থলে স্ত্রীলোক প্রায় পুংবদ্ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। অপর দিকে ধর্ম্মসমাজশাসিত প্রাচীন জগতের ইয়োরোপের একপ্রান্ত গ্রেট ব্রিটেন হইতে এশিয়ার অপর প্রান্ত জাপান পর্য্যন্ত নারীবিদ্রোহের রক্তপতাকা উড্ডীন হইয়া ধর্ম্ম সমাজ ও সংসার ধূলিসাৎ করিবার প্রবল চেষ্টা করিতেছে। এই নারীবিপ্লব সকল ধর্ম্মেরই পরিপন্থী—কি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, কি প্রাচীন ইহুদীধর্ম্ম, কি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, কি ইসলামধর্ম্ম, কোন ধর্ম্মই এই নারীবিদ্রোহ সমর্থন করেন না। এই নারীবিদ্রোহের মূল—জড়বাদ, ইহলোকপরতা ও নাস্তিক্য অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্তশূন্য অহমিকাবিজৃম্ভিত বিচারবুদ্ধি। সুতরাং এই নারীজাগরণ যে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান, ইহা বিশেষভাবে প্রত্যেক সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। আমাদের শাস্ত্র ও সমাজে এই নারীর স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা আদৌ স্বীকৃত হয় নাই। তাহার ধর্ম্মসেবা ও সংসারযাত্রা পুরুষের সাহচর্য্যে বিহিত হইয়াছে; তাহা বলিয়া নারীকে হীন বা মর্য্যাদাশূন্য করা হয় নাই। শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ মাতৃভাবে নারীকে জগদীশ্বরীর অংশ—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎসু' বলিয়া নারীমর্য্যাদার চরমসম্মান করা হইয়াছে। নারীকে মূর্ত্তিমতী শ্রী

বলিয়া তাহার যথোচিত সম্মানের বিধান পুনঃ পুনঃ দেওয়া হইয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রীর সম্পর্ক অৰ্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে সুন্দরভাবে প্রকটিত হইয়াছে ; ইহা অপেক্ষা সুন্দর পরিকল্পনা আর কি হইতে পারে ? নারীজীবনের চরম উৎকর্ষ 'মাতৃত্ব'—সমাজ, সংসার, প্রকৃতি, ধর্ম্ম সকলেই এই উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া নারীধর্ম্মের বিধান করিয়াছেন। নারীই সমাজের সংরক্ষক ও স্থিতিস্থাপক—নারীর নাশে সমাজের নাশ। নারীরক্ষাই সামাজিক-বর্গের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিতেছেন যে—

কুলস্ত্রীগণ দুষ্ট হইলে বর্ণসঙ্কর সমুৎপন্ন হয় এবং এই বর্ণসঙ্কর নরকের কারণ। গৃহের শালগ্রামশিলা ও কুলস্ত্রী উভয়ই পবিত্রভাবে শুদ্ধান্তের মধ্যে রক্ষণীয়—ইহারা সাধারণের জন্য নহে। উভয়েই পরম পবিত্র এবং উভয়ের সম্বন্ধে বিশেষ শুচিতা অবলম্বনীয়। কেবল অবরোধে অবরুদ্ধ থাকিলেই কুলস্ত্রীগণ রক্ষিত হ'ন না—ভাবদুষ্টি হইতে ইঁহাদের রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়ঃ রক্ষ্যাঃ বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হিকুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ ॥

স্ত্রীজাতি সামান্য দুঃসঙ্গ হইতেও রক্ষণীয়, কারণ অরক্ষিত হইলে তাহারা পতি ও পিতৃকুলের দুঃখের কারণ হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানকালে নানাবিধ সংবাদপত্র, মাসিকপত্রিকা ও উপন্যাস অতি কদর্য্য ও অশ্লীলভাব চারিদিকে প্রচার করিতেছে। পূর্ব্বে লোকে শাস্ত্রদৃষ্টিতে স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারণ করিত। অধুনা গ্রাম্যবার্ত্তাবহ সংবাদপত্রসমূহ লোকের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিতেছে, এজন্য আমরা দিন দিন সত্যপথবিচ্যুত হইয়া সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতেছি। ধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধে আমরা কোন বিষয়ে বাহিরের লোকের কথা শুনিতে

চাহি না—অত্র শ্রীভগবানের বাণীই আমাদের পথিপ্রদর্শক। শাস্ত্রই ভগবানের বাণী—শাস্ত্রবাক্যে অবিচলিত বিশ্বাসই আস্তিক্য। অতএব এ বিষয়ে শাস্ত্র যাহা বলিতেছেন, তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

শাস্ত্রের প্রথম কথা স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য নাই। নারীস্বাধীনতা বা নারীর স্বৈরাচার কোনমতেই সনাতনধর্ম্মসম্মত নহে।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রাঃ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

—মনু ৯।৩

স্ত্রীলোকের গুরুগৃহে বাস বা যজ্ঞাদি কোন কর্ম্মই বিহিত হয় নাই—বিবাহের পর পতিসেবাই তাহাদের একমাত্র পরম ধর্ম্ম।

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃস্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥

—মনু ২।৬৭

"বিবাহসংস্কারই স্ত্রীলোকের বৈদিক উপনয়নসংস্কার—ইহাতে স্বামীর সেবাই গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্ম্মই সায়ংপ্রাতর্হোমরূপ অগ্নি-পরিচর্য্যা বলিয়া জানিবে।"

পতিই হিন্দুনারীর পরমদেবতা; পতি শতদোষদুষ্ট হইলেও তাঁহার পূজ্য ও অত্যাজ্য—ইহাই সনাতন ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত।

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎপতিঃ॥
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন, তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

সুতরাং সনাতনশাস্ত্রমতে নারীগণের পক্ষে পতিই ধ্যান, জ্ঞান ও জপমালা; নারীর পতিই গুরু ও পরমদেবতা। সতী, সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী, অনসূয়া, লোপামুদ্রা প্রভৃতি পতিদৈবতগণ পতিসেবা ও পতিভক্তি দ্বারা প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া আছেন। নারী সর্ব্বাংশে স্বামীর সহধর্ম্মিণীস্বরূপা—সকল কার্য্যেই নারী পুরুষের সাহচর্য্য করিবেন; গৃহে তিনি গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় থাকিয়া গৃহের শ্রী, সৌন্দর্য্য সংরক্ষণ করিবেন।

"স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।"

—মনু ৯। ২৬

পুনশ্চ বলা হইয়াছে—

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৄণামাত্মনশ্চাপি॥

মনু ৯। ২৮

দৈব, পৈত্র কার্য্য, ইহলোক ও পরলোকের সুখসম্ভোগ, এককথায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সকলই স্ত্রীর অধীন। এই বিবেচনায় নারীর প্রতি অতি সামান্য অত্যাচারও মহাপাপ।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
যাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যাঃ ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥

অর্থাৎ "যে কুলে নারীগণের সম্যক্ আদর আছে, দেবতারা তথায় প্রসন্ন আছেন। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারে যাগাদি ক্রিয়াকর্ম্ম সমুদায় বৃথা হইয়া যায়। যে পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সদাই দুঃখিত থাকেন, সেই কুল আশু বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যথায় স্ত্রীলোকের কোন দুঃখ নাই, সেই পরিবারের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়। স্ত্রীলোকগণ অসংকৃত থাকাতে যে গৃহে অভিসম্পাত করেন, সেই কুল অভিচারহতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব যাঁহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সৎকার্য্যকালে এবং উৎসবকালে নিত্যই অশনভূষণাদি দ্বারা স্ত্রীলোকের সমাদর করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। যে পরিবারের মধ্যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়ে পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, নিশ্চয়ই সেই কুলে কল্যাণ নিশ্চিন্ত-ভাবে অবস্থিতি করে।" (মনু ৩। ৫৬—৬০) আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের পুনঃ পুনঃ স্মরণ রাখা উচিত যে লক্ষ্মীস্বরূপা জগদম্বার অংশভূতা নারীর প্রতি অত্যাচার বা অবমাননা আদৌ ধর্ম্মসঙ্গত নহে; এই অধর্ম্ম্য ব্যবহার সর্ব্বনাশের মূল এবং ইহামুত্র অশুভজনক।

হিন্দু নারীর পতিই দেবতা, পতিগৃহই তাহার গুরুকুল, পতিসেবাই তাহার ব্রত। পতিসম্বন্ধে শ্বশুর ও শ্বশ্রূ তাহার পরমগুরু ও দেবর তাহার ভ্রাতা। হিন্দুনারীর গৃহই কর্ম্মক্ষেত্র—গৃহের বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের অধিকার। ইহার ব্যতিক্রমে কুফলের সম্ভাবনা। অধুনা এই ভাবের ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে—ইহার বিষময় ফলে বহু সংসার জীর্ণারণ্যে পরিণত হইতেছে। হিন্দুনারী জায়া ও মাতারূপেই প্রপূ-

জিতা—তাহার যে অন্যরূপ, তাহা প্রকৃতির বিকারমাত্র। মাতৃরূপে যিনি সংসার সংরক্ষণপূর্ব্বক দেশের ভবিষ্যদাশা সন্তানগণের চরিত্রগঠন করিতে পারেন তিনিই প্রকৃতভাবে দেশের সেবা করেন—ইহা অপেক্ষা মহত্তর সেবা আর কি হইতে পারে? মাতৃত্ব অপেক্ষা মহনীয় ও পূজনীয় আর কি আছে? দেশসেবাই বল আর জনসেবাই বল সকলই ধর্ম্মের অধীন—যে কর্ম্মে ধর্ম্মহানি হয়, তাহা দেশসেবার নামে প্রচ্ছন্ন পাপ মাত্র; তাহা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। অনেক সময় সুন্দর ও উচ্চ আদর্শের নাম দিয়া আমরা স্বৈরাচারের প্রশ্রয় দিয়া থাকি। আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। ধর্ম্ম বা দেশের নাম লইয়া স্ত্রীপুরুষের অবাধ সংমিশ্রণের পরিণাম অতি ভয়াবহ। একথা স্মরণ রাখা উচিত—

ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।

অপরদিকে যাঁহারা মনের দৃঢ়তার কথা ভাবিয়া আত্মপ্রবোধ বা আত্ম-বঞ্চনা করেন, তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত—

বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

শাস্ত্রে ও ব্যবহারে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। চক্ষুঃ থাকিতে যাহারা অন্ধ হইবে তাঁহাদের কথা বলিবার কিছুই নাই। সমাজে ও সংসারে ধর্ম্মনাশক অবাধ সংমিশ্রণ হইতে প্রত্যেক হিন্দু সাবধান হইবেন। স্ত্রীলোককে কদাপি স্বাতন্ত্র্য দিবেন না—ইহা শাস্ত্রে বারংবার আদিষ্ট হইয়াছে—

অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্ ॥

কিন্তু যে স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্য, স্বৈরাচার বা স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া নারীপ্রগতি বা নারীবিগতির চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে

আমাদের কিছু বলিবার নাই—তবে ইহা কুলবধূর আদর্শ নহে, এবং ইহা যে একান্ত হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইব।

স্ত্রীলোকগণ এই কয়টী বিষয় হইতে সাবধান থাকিবেন—

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারী সন্দূষণানি ষট্॥

পান, দুর্জ্জনসংসর্গ, পতিবিরহ, যথা তথা ভ্রমণ, অকালনিদ্রা, পরগৃহবাস—এই ছয়টীতে নারীর চরিত্র দূষিত হয়। দুষ্টসংসর্গ যে দুষ্টপুরুষসংসর্গ তাহা নহে, এমন কি দুষ্ট বা স্বৈরাচার স্ত্রীলোকের সহিতও নারীদিগকে মিশিতে দিবে না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী।
কুর্য্যাচ্ছ্বশুরয়োঃ পাদবন্দনং ভর্ত্তৃতৎপরা॥
ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥
রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন ক্বচিৎ স্ত্রীয়াম্॥

অর্থাৎ স্ত্রীলোক গৃহোপকরণ বস্তু গুছাইয়া রাখিবে, কাজকর্ম্মে তৎপর হইবে, সর্ব্বদা হাস্যমুখে থাকিবে, অধিক ব্যয় করিবে না, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণ বন্দনা করিবে এবং সকল কার্য্যই স্বামীর বশবর্ত্তিনী হইয়া করিবে। স্বামী বিদেশে যাইলে স্ত্রী ক্রীড়া, শরীরসংস্কার, সভাদর্শন, উৎসবদর্শন, হাস্যপরিহাস, পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবে। কন্যাকালে পিতা, বিবাহের পর ভর্ত্তা এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রগণ রক্ষা করিবেন। যে সময়ে প্রকৃত রক্ষকের অভাব হইবে সে সময়ে বন্ধুবান্ধবগণ রক্ষা করিবেন;

কোন সময়েই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা থাকিবে না।" মহর্ষি বিষ্ণু সূত্রাকারে এইভাবে নারীধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন।

অথ স্ত্রীণাং ধর্ম্মাঃ ॥ ১ ॥

ভর্ত্তুঃ সমানব্রতচারিত্বম্ ॥ ২ ॥

শ্বশ্রূশ্বশুরগুরুদেবতাতিথিপূজনম্ ॥ ৩ ॥

সুসংস্কৃতোপস্করতা ॥ ৪ ॥ (সমস্ত গৃহদ্রব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা)

অমুক্তহস্ততা ॥ ৫ । (দানকৃপণতা)

সুগুপ্তভাণ্ডতা ॥ ৬ ॥ (ধনপাত্র গোপনে রাখা)

মূলক্রিয়াস্বনভিরতিঃ ॥ ৭ ॥ (বশীকরণাদির চেষ্টা না করা)

মঙ্গলাচারতৎপরতা ॥ ৮ ॥

ভর্ত্তরিপ্রবসিতেঽপ্রতিকর্ম্মক্রিয়া ॥ ৯ ॥

[পতি বিদেশে গেলে সকল প্রকার বেশভূষা ত্যাগ]

পরগৃহেষনভিগমনম্ ॥ ১০ ॥

[প্রোষিতভর্ত্তৃকার পরগৃহবাস নিষিদ্ধ]

দ্বারদেশে গবাক্ষকেষনভিস্থানম্ ॥ ১১ ॥

[দরজায় দাঁড়াইয়া বা জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া থাকা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ]

মহর্ষি বাৎস্যায়নও ভার্য্যাধিকরণে ইহা লিখিয়াছেন 'দুর্ব্যাহৃতং দুর্নিরীক্ষিতমন্যতো মন্ত্রণং দ্বারদেশাবস্থানং নিরীক্ষণং বা নিষ্কুটেষু মন্ত্রণং বিবিক্তেষু চিরমবস্থানমিতি বর্জ্জয়েৎ।' [অর্থাৎ "কুবাক্য প্রয়োগ, কুদৃষ্টিতে দেখা, অন্যের সহিত গোপনে কথা বলা, দ্বারদেশে অবস্থান, দ্বারদেশ হইতে পথের দিকে দৃষ্টিপাত, গৃহোদ্যানে গিয়া মন্ত্রণা করা, স্বামীর অগোচরে নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি, এই সকল কার্য্য বর্জ্জন করিবে।"]

সর্ব্বকর্ম্মস্ব স্বতন্ত্রতা॥ ১২॥ [কোন কার্য্যেই স্বেচ্ছাচার বা স্বাধীনতা অবলম্বন না করা]

বাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যেষ্বপি পিতৃভর্ত্তৃপুত্রাধীনতা॥ ১৩॥

মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা॥ ১৪॥

পুরুষ ও স্ত্রী লইয়া সংসার। স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সহচরীরূপে তাহার সাহচর্য্য ও সেবা করিবে। স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, লজ্জা, অচাপল্য, ইহাই হিন্দুনারীর সর্ব্বস্ব। ধর্ম্মই হিন্দুনারীর প্রাণ। শিক্ষা দীক্ষা সকলই এই নারীধর্ম্মের পরিপোষকতার জন্য—যে শিক্ষাদীক্ষায় এই সকল ধর্ম্মের হানি ঘটে, তাহা শিক্ষার নামে অপশিক্ষা মাত্র। আধুনিক শিক্ষা সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পরিপন্থী; এই শিক্ষার পরিবর্ত্তে যে শিক্ষায় ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ শিক্ষাই আর্য্যনারীদের দেওয়া কর্ত্তব্য। নারীও পুরুষের ন্যায় শিক্ষার অধিকারিণী, কিন্তু নারীর শিক্ষা পুরুষের শিক্ষা হইতে কতকটা বিভিন্ন হইবে; যেহেতু পুরুষ ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অধুনা যে নারী সর্ব্বত্র পুরুষের সহিত সমান অধিকার প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছে এবং বহুস্থলে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া বিচরণ করিতেছে, ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম ও প্রকৃতির ব্যভিচারমাত্র। এই প্রগতি বা বিকৃতি কদাপি আর্য্যধর্ম্ম সমর্থিত নহে। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক—ইহা একান্তভাবে জড়বাদসম্ভূত, ভোগলালসাবৰ্দ্ধক, ধর্ম্মধ্বংসী ও জাতীয়ভাবের নাশক। এই শিক্ষা জীবন সংগ্রামের জন্য পুরুষ সহজে ত্যাগ করিতে পারিতেছে না; কিন্তু তাহার সহিত অনর্থক এই বিষোপম শিক্ষায় নারীগণকে শিক্ষিত করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করা হইতেছে এবং সমাজ ও সংসারে বিপ্লব ডাকিয়া আনা হইতেছে। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"; কিন্তু কুশিক্ষা

ও অপশিক্ষা হইতে অশিক্ষাও ভাল। আমাদের পিতামহী ও মাতামহী-গণ নিরক্ষর ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া অশিক্ষিত বা মনুষ্যত্বহীন ছিলেন না। স্ত্রীশিক্ষায় যাহাতে ভারতের স্ত্রীলোকের বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম্মভাব বজায় থাকে, সে বিষয়ে আমাদের প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হিন্দুনারী যাহাতে ধর্ম্মশীলা, আচারপরায়ণা, সুশীলা, গৃহকর্ম্মদক্ষা, সন্তানরক্ষায় সুনিপুণা, সংসারের সর্ব্বব্যাপারে সুপটু, লজ্জা ও শালীনতায় শোভনা হইতে পারে, এই ভাবে তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। সংসারই নারীর কর্ম্মক্ষেত্র—সংসারক্ষেত্রে নারী যাহাতে সুদক্ষ হয়, তাহারই সুব্যবস্থা করিতে হইবে। কেহ বলিতে পারেন, নারী কি দেশসেবার কর্ম্ম করিবেন না—নারী সকলক্ষেত্রেই পুরুষের সহচারিণী হইবেন না? এক্ষেত্রে বক্তব্য, সংসারের মধ্য দিয়া যে সেবা, তাহা কি দেশসেবা নয়? যাহাতে ধর্ম্মভাব সঙ্কুচিত বা বিধ্বস্ত হইতে পারে, সেইরূপ কার্য্য কদাপি আর্য্যধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে না। নারীর নিকট একমাত্র পতিই পুরুষ—তিনি পতির সহধর্ম্মিণী হইবেন, অপর পুরুষের নহে; অবাধসংমিশ্রণ হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে।

আর্য্যধর্ম্মে বিবাহ একটী সংস্কার ও ধর্ম্মাঙ্গ। নরনারী একবার বিবাহবদ্ধ হইলে সে সম্বন্ধ আর কোনমতেই ছিন্ন হইতে পারে না। সে সম্বন্ধ কেবল ইহকাল নহে, এমন কি পরকাল পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। এই বিবাহ সংস্কার, নারীর প্রধান সংস্কার—ইহাই তাহাদের উপনয়ন-স্বরূপ। প্রকৃত কথা বলিতে কি, বিবাহসংস্কার না হইলে হিন্দুধর্ম্মে নারী শুদ্ধা বলিয়া বিবেচিত হয় না। চিরব্রহ্মচারিণী নারী হিন্দুধর্ম্মে স্বীকৃত হইলেও ব্রহ্মচর্য্যবিরহিতা কুমারী নারী আর্য্যধর্ম্মবহির্ভূত। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কেহই অনাশ্রমী হইয়া বাস করিতে পারিবে না। বিবাহের পর নারী পতিকুলে বাস করিবেন, পতিসেবাই তাহার প্রাণ

হইবে এবং পতিগতপ্রাণা হইয়া নারী কালাতিপাত করিবেন। পতির মৃত্যুর পর নারী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিবেন। বিধবার পত্যন্তরগ্রহণ সাধারণতঃ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত নহে। হিন্দু নারীর পক্ষে পতি মৃত হইলেও সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ সর্ব্বপ্রকার বিলাসত্যাগ, সংযম, ইন্দ্রিয়সুখত্যাগ ও ধর্ম্মময়জীবন যাপন। আমাদের সমাজে অধুনা নানা অধর্ম্মের সঞ্চার হইয়াছে, ইহার প্রধান কারণ নারীর উপর নানা-প্রকার অত্যাচার। পণপ্রথা নারীনিগ্রহের নামান্তর মাত্র; সন্ন্যাসব্রত-ধারিণী বিধবা হিন্দুগৃহে অধুনা দাসীর ন্যায় ব্যবহারপ্রাপ্তা হ'ন। বহু সংসারের গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা বধূ সর্ব্বদা নিপীড়িতা হ'ন। কন্যা ও বালকের মধ্যে ব্যবহারের বিরাট্ তারতম্য বহুস্থলে অত্যন্ত দুঃখপ্রদ। এই সমস্তই অধর্ম্মপ্রসূত—ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মাচরণ সংসারে থাকিলে এ সকল বিদূরিত হইবে। হিন্দু বিধবার স্থান সংসারে সর্ব্বদাই অতি পূজ্য—তিনিই সংসারের ধর্ম্মাচরণে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, তাঁহার পবিত্র জীবন সংসারের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত। যে স্থলে সেবার প্রয়োজন, সেই স্থলে তাঁহার কল্যাণময় কর প্রসারিত, যে স্থলে গৃহ আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় মুহ্যমান, সেই স্থলে তাঁহার কণ্ঠে অভয়প্রদ মাভৈঃ বাণী। বাঙ্গালার গৃহে এই ব্রহ্মচারী, পবিত্র, সেবাপর, বৈধব্যজীবন হেয় ও অবজ্ঞেয় নহে, ইহাই আমাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখা উচিত।

এই নারীপ্রগতির যুগে ও স্ত্রীপুরুষের একত্র মেলামেশা পঠনপাঠনের দিনে সনাতনধর্ম্মের এই সকল উপদেশ অনেকের নিকট নিতান্ত গ্রহণ-যোগ্য নহে বলিয়া মনে হইতে পারে। নাস্তিক ও অলীক নামধারী হিন্দুগণ ইহা উপহাসযোগ্য মনে করিতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথেই চলিবে। যদি বর্ণব্যবস্থা, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম মানিতে হয়, তবে ইহা ভিন্ন আর কি পথ আছে? অবাধ মেলামেশায়,

সহশিক্ষায় বর্ণব্যবস্থার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী—সুতরাং সেরূপ শিক্ষা কদাপি শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুর অনুমোদিত হইতে পারে না। খনা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতীর দোহাই দিয়া আমরা সমাজে 'বিবি প্যাঙ্কহার্ষ্ট' চাই না—ধর্ম্মনাশের যে স্থলে সম্ভাবনা, সে স্থলে আমরা এমন কি ম্যাদাম কুরীরও প্রয়োজন বোধ করি না। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে দু' দশটী ধাত্রী, চিকিৎসক, কেরাণী, শিক্ষয়িত্রী ও লেডি টাইপিষ্টই পাইতেছি—এই শিক্ষার মোহে আমরা কুলস্ত্রীকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া ভোগলোলুপদৃষ্টি পুরুষের সম্মুখীন করিতেছি। বিরাট বিলাসব্যসনে কুতূহলী হইয়া শুদ্ধান্তঃচারিণী অন্তঃপুরিকাকে বহিশ্চারিণী করিতেছি। হায় বৈদেশিক মোহ! আমরা স্ত্রীস্বাধীনতার মোহময় উদ্দীপনায় বিমুগ্ধ হইতেছি, কিন্তু অধুনাতন শিক্ষিত ও স্বাধীন স্ত্রীলোকের মধ্যে আমাদের মজ্জাগত সেই শীলতা ও শালীনতার গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি কৈ? ইহাদের অনেকের অঙ্গের প্রত্যেক রেখাটী পরিস্ফুট করিবার প্রমত্ত চেষ্টার নিকট বারবণিতাও যে পরাজিত হয়! ইহাই কি নারীপ্রগতি? এই প্রগতির দুর্গতি হইতে দেবী দুর্গা আমাদের রক্ষা করুন। আমরা নারীমূর্ত্তিতে মাতৃমূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে চাই—তিনি গৃহে গৃহলক্ষ্মী, সংসারে অন্নপূর্ণা, আপদে বিপদে অভয়শক্তিস্বরূপা। হিন্দুর সংসারে প্রপূজিতা সতী সীতা সাবিত্রীর সাধনা তাঁহার হৃদয়ে হোমাগ্নির ন্যায় সর্ব্বদাই উজ্জ্বল। এই নারীশক্তি সনাতন ধর্ম্মকে প্রবুদ্ধ করুক—ইহাই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সাধনা ও উপাসনা

"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত"—ইহা শাস্ত্রের আদেশ ; অর্থাৎ প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দনা করিবে ; ইহা দ্বিজাতির নিত্যকর্ম্ম। এই কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য—করিলে কোন পুণ্য নাই ; কিন্তু না করিলে পাপ। সন্ধ্যা-বন্দনাহীন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহে—সে নিতান্ত অশুচি ও বর্জ্জনীয়। সর্ব্বজাতির পক্ষেই সন্ধ্যাবন্দন বিহিত হইয়াছে। দ্বিজাতির পক্ষে বৈদিক সন্ধ্যাবন্দন ও শূদ্রের পক্ষে তান্ত্রিক বা পৌরাণিক দীক্ষা বা সন্ধ্যাবন্দন বিহিত হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মে একটী প্রধান কথা অধিকারিবাদ। সকলেরই সমান শক্তি বা গুণ নাই এবং সকলের পক্ষে একই বস্তু বিহিত হইতে পারে না। সুতরাং যাহার যেরূপ ক্ষমতা বা অধিকার তাহার জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বৈদিক সন্ধ্যা ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্ত্তব্য—অধুনা ইংরেজী শিক্ষিত বহু ব্রাহ্মণসন্তান সন্ধ্যাবন্দনা ত্যাগ করিয়াছেন। সময়ের অভাব ইহাই তাঁহাদের প্রধান কথা ; কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, অহোরাত্রের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আহার, নিদ্রা, অর্থোপার্জ্জন, গল্প করা, খবরের কাগজ পড়া, নভেল পড়া প্রভৃতি সকল বিষয়ের জন্য সময় হয়, কেবল ভগবদুপাসনার সময় হয় না ! এ সমস্ত আলস্য ও অনিচ্ছার ছল ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষের সকল বিষয়ে সময় হয়, দশমিনিট, পনেরমিনিট, অর্দ্ধঘণ্টা বা একঘণ্টা দাঁড়াইয়া বসিয়া একটু ভগবানের নাম লওয়ার সময় হয় না ! ইচ্ছা থাকিলেই সময় পাওয়া যায়, সময় করিয়া কিছুদিন কার্য্য করিলে অভ্যাস হইয়া

যায়—অভ্যাস সংস্কারে দাঁড়াইলে তাহা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে ; তাহা আর ত্যাগ করা যায় না। ধর্ম্মের পথে আসিতে হইলে এ সকল বিষয়ে প্রথমতঃ তীব্র ইচ্ছা, সাধনা ও সৎসঙ্গ, দ্বিতীয়তঃ সদাচার ও তৃতীয়তঃ নামজপ, গুণানুবাদ ও ভগবচ্চিন্তনের প্রয়োজন। *

কলিযুগে সাধুসঙ্গ বড়ই দুর্লভ—প্রকৃত ভক্ত রত্নের ন্যায় দুর্লভ। সাধুসঙ্গ লাভ হইলে তবেই সুমতি হয়, অনেক পুণ্যে সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে। শাস্ত্র বলিতেছেন, "সকল বেদশাস্ত্রসিদ্ধান্ত রহস্যজন্মাভ্যস্তাত্যন্তোৎকৃষ্ট সুকৃত পরিপাকবশাৎ সদ্ভিঃসঙ্গো জায়তে। তস্মাদ্ বিধিনিষেধবিবেকো ভবতি। ততো সদাচারপ্রবৃত্তির্জায়তে। সদাচারাদখিলদুরিতক্ষয়ো ভবতি। তস্মাদন্তঃকরণমতি বিমলং ভবতি। ততঃ সদ্গুরুকটাক্ষমন্তঃকরণমাকাঙ্খতি। তস্মাৎ সদ্গুরুকটাক্ষলেশবিশেষেণ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ সিধ্যন্তি।"

ইহার ফলিতার্থ এই যে, নানাশাস্ত্রাভ্যাসরূপ সুকৃতির ফলে সাধুসঙ্গ ঘটে ; সাধুসঙ্গ হইলে বিধিনিষেধজ্ঞান হয়, তাহা হইতে সদাচার প্রবৃত্তি হয়। আচার পালনে পাপক্ষয় হয় ও তাহাতে মন নির্ম্মল হয়। মন পবিত্র হইলে গুরুকৃপার জন্য মন ব্যস্ত হয়। গুরুকৃপালাভ হইলে সর্ব্বসিদ্ধি করতলগত হয় ; সুতরাং সাধুসঙ্গের প্রতি আমাদের প্রথম লক্ষ্য করা উচিত। সাধু ও ভক্তসঙ্গ যখন দুর্লভ তখন আমাদের ঋষিসঙ্গ অর্থাৎ শাস্ত্রবাণী শ্রবণ, মনন ও আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্রপাঠ বা আলোচনদ্বারা আমাদের আর্ষসঙ্গলাভ ঘটে। রামায়ণ মহাভারত ভাগবতাদি পুরাণ পাঠে মন নির্ম্মল হয়, প্রাণে শান্তি আসে

---

* হিন্দুধর্ম্ম নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রন্থে এ বিষয়ে অতি সুন্দর আলোচনা আছে। হিন্দুধর্ম্ম—শ্রীশক্তিচরণ বিশারদ, আলোপীবাগ, প্রয়াগরাজ।

ও সাধনভজনে প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। বিশেষতঃ হরিকথা দেববিদ্বেষ-দ্রোহীকে পর্য্যন্ত অভিভূত করিয়া থাকে।

হরেঃ কথামৃতং যত্র তত্র তীর্থাদিকং বসেৎ।
গুণবাদ রতানাং হি হরির্দেহং সমাশ্রয়েৎ ॥

দ্বিতীয় কথা—সদাচার। সাধনমার্গে চলিতে হইলে সদাচার সম্বন্ধে বিশেষ অনুধাবন করা আবশ্যক। আচারের গূঢ় অর্থ সংযম ও মনের পবিত্রতা। দেহ ও মন পবিত্র না থাকিলে, মনে ভগবদ্ভক্তির স্ফূর্ত্তি ঘটে না। যে লোক সদৈব ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অনাচারী, অসাধু দিনান্তে একবার মালা জপিলে বা বর্ষান্তে একবার ধূমধাম করিয়া পূজা করিলে তাহার কি ফল হইবে? মন পবিত্র না হইলে সাধন ও ভজন সকলই বৃথা। দ্রব্যশুদ্ধি ও ক্রিয়াশুদ্ধির ন্যায় ভাবশুদ্ধিরও একান্ত প্রয়োজন। সাধনরাজ্যের প্রথম কথা শম ও দম। অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম শম ও বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম দম। সাধারণ ব্যক্তির প্রথম কার্য্য দম। মনের মধ্যে পরস্ত্রীলাভের চেষ্টা আসিলে তাহা দমন করা কর্ত্তব্য—পরস্ত্রী-সঙ্গ হইতে বিরত থাকাই আচার! যে আচার পালন করে, সর্ব্বতো-ভাবে না হইলেও, অন্ততঃ বাহ্যতঃ সে পাপ হইতে বিরত হয়; পরন্তু যখন 'মাতৃবৎ পরদারেষু', মনে এই দৃঢ়জ্ঞান জন্মে; পরস্ত্রীর প্রতি কোন লিপ্সা আসে না, তখন শম আসে। শম ও দম উভয়ই আবশ্যক, কিন্তু দুর্ব্বল মন যদি শমের অভ্যাস করিতে না পারে তবে তাহার পক্ষে দম অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন। যে দমেরও অপেক্ষা রাখে না, সে স্বৈরাচারী পশু—তাহার পক্ষে আবার সাধন ভজন কি?

সদাচারের মধ্যে সন্ধ্যাবন্দন অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাবন্দনে প্রথমতঃ স্নানাদি কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ মন ও বুদ্ধির পবিত্রতাসাধক উপাসনা বিহিত

হইয়াছে। সন্ধ্যার মধ্যে আমরা মার্জ্জন, প্রাণায়াম, আচমন, অঘমর্ষণ, সূর্য্যোপস্থান, গায়ত্রী জপ—এই কয়টী প্রধান ব্যাপার দেখিতে পাই। মার্জ্জন দ্বারা দেহের ও মনের পবিত্রতা, প্রাণায়ামে ধ্যান ধারণা ও প্রাণশক্তির পরিপোষণ, অঘমর্ষণে পাপক্ষালন ও দিব্যভাবধারণ, সূর্য্যোপস্থানে ভগবানের চরমবিকাশ শ্রীশ্রীসবিতৃদেবের উপাসনা ও নানাদেবকে জলদান এবং সর্ব্বশেষে গায়ত্রীজপে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিশোধনের জন্য প্রার্থনা। এই প্রার্থনায় বাসনা কামনার কালিমা নাই—ইহা 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং' ভর্গের ধ্যান ও আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সংস্কারের জন্য প্রার্থনা। মায়াবিজৃম্ভিত ও অহংভাবে বিমলিন বুদ্ধিবৃত্তির মার্জ্জনা অপেক্ষা আমাদের কি আর শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা থাকিতে পারে? প্রকাশ যে হয় না, তাহার কারণ দর্পণের দোষ—দর্পণ পরিষ্কৃত করিলে জ্ঞানের অমল প্রভা বিকশিত হইবে। সংসারের মূল মায়া ও মায়ার ফলই বিক্ষেপ ও আবরণ; মায়ায় আমাদের যাহা স্বরূপ, তাহা আবৃত হইয়া আছে এবং চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সংসারে আসিলেই মায়ার জালে পড়িতে হইবে এবং এই মায়াজাল হইতে মুক্তির জন্য ধীবৃত্তির সংশোধন প্রথম ও প্রধান কার্য্য।

মূলং ধর্ম্ম বিনাশস্য প্রথমং স্যাদহঙ্কৃতিঃ।
মূলং সংসারবৃক্ষস্য সা এব কথিতা বুধৈঃ॥
মোহমূলমহঙ্কারঃ সংসারস্তদ্‌সমুদ্ভবঃ।
অহঙ্কারবিহীনানাং ন মোহো ন চ সংসৃতি॥

গায়ত্রী জপই অহঙ্কার ছেদনের কুঠার স্বরূপ। যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রীহীন সে শূদ্রাদপি অধম। যাহাদের বৈদিক দীক্ষা নাই, তাহাদের পক্ষে তান্ত্রিকদীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক সাধনরাজ্যে প্রবেশপথ সুগম করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় কথা—নামজপ, গুণানুবাদ ও ভগবচ্চিন্তন। প্রত্যেক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে এই নামজপ, গুণানুবাদ ও ভগবচ্চিন্তন নিত্য কর্ত্তব্য। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন,—যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি। জপই প্রধান যজ্ঞ এবং 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'। হরিনাম জপই এই যুগে তারকব্রহ্ম নাম—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই হরিনামের দীক্ষাবিধি কিছুই নাই—যেই লয় সেই উত্তীর্ণ হয়। সুতরাং সকাল সন্ধ্যায়—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই নামচিন্তামণিজপ আধ্যাত্মিক কল্যাণের পরম সেতু। হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী সকলেরই ইষ্টনামজপ একান্ত বিধেয়। যিনি শাক্ত, তিনি দুর্গানাম জপিবেন, শৈব শিবনাম কীর্ত্তন করিবেন,—এইরূপে সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায় স্ব স্ব ইষ্টদেবের নাম জপ করিবেন। গুণানুবাদ অর্থাৎ গুণকীর্ত্তন বা মহিমাবর্ণন—শ্রীভগবানের জীবের প্রতি অসীম করুণা, তাঁহার দয়া, তদীয় লীলা ও মহিমাকীর্ত্তনে জীবের পাপ কাটিয়া যায় ও ভগবৎকৃপালাভ হয়। বিশেষতঃ ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার করুণার কথা বার বার স্মরণ করা—তিনি আমায় কত দয়া করিয়াছেন, কিরূপে আমার পুত্র, বিত্ত, প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, কত আপদে বিপদে রক্ষা করিয়াছেন, কত সুখ সুবিধা করিয়াছেন. এইরূপ ভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া স্মরণ করিলে বিশেষভাবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা হয় এবং এইভাবে স্মরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক কৃতার্থতা

লাভ করা যায়। এই ভাবকে স্থায়ী করিয়া দিবারাত্র ভগবচ্চিন্তনে মানব সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকে। মন একটু বিরাম পাইলেই ভগবানের চরণে লুটাইয়া পড়ে—এই ভাব দৃঢ় হইলে সংসারের পাশ কাটিয়া যায় এবং জীব শ্রীভগবানের কৃপালাভ করে।

সংক্ষিপ্য তত্র বঃ সারং সাধনং প্রব্রবীম্যহম্।
শ্রোত্রেণ শ্রবণং তস্য বচসা কীর্ত্তনং তথা
মনসা মননং তস্য মহাসাধনমুচ্যতে॥

হিন্দু সাধনরাজ্যের প্রথম কথা দীক্ষা। দীক্ষা না হইলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ অতি কঠোর। শাস্ত্রে সর্ব্বাশ্রমেই দীক্ষার বিধান রহিয়াছে।

দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ।
দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্ যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্॥
অদীক্ষিতাঃ যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥
দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ॥

[তন্ত্রসারঃ]

যথাবিধি দীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার পাপ নষ্ট হয় ও সাধনরাজ্যে প্রবেশলাভ ঘটে। গ্রন্থদৃষ্টিতে মন্ত্রজপে মন্বন্তর নিরয়নিবাস শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। অদীক্ষিতের তপো ব্রত, নিয়ম, তীর্থগমন প্রভৃতি কিছুই নাই। সদ্গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ সাধনকামী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরু সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে :—

শান্তো দান্তো কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্!
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচিদক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্।
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

শমাদমাদি গুণসম্পন্ন, কৌলধর্ম্মপরায়ণ, অভিমানশূন্য, পবিত্র বেশধারী, সদাচারী, ক্রিয়াকুশল, বিশুদ্ধাচার, আশ্রমী, ধ্যানপরায়ণ, তন্ত্রমন্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিই গুরুপদযোগ্য। ক্রিয়াহীন, বিকলাঙ্গ, স্ত্রৈণ, বহুভোজী, শঠ, গুরুনিন্দক ব্যক্তিকে কদাপি গুরু করিবে না। দেওঘরের খ্যাতনামা শ্রীশ্রীবালানন্দ স্বামীজী গুরুসম্বন্ধে লেখককে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। 'গুরু' তিন প্রকার—তরণ, তারণ ও তরণতারণ। যিনি সাধনদ্বারা স্বয়ং মুক্তিলাভ করেন; কিন্তু শিষ্যবর্গের কিছু করিতে পারেন না তিনি 'তরণ'। যিনি নিজে উদ্ধার পান না, কিন্তু উদ্ধারের পথ বলিয়া দিতে পারেন, তিনি 'তারণ'। আর যিনি স্বয়ং মুক্তিলাভ করেন এবং শিষ্যের মুক্তিসাধন করিতে পারেন তিনি "তরণ ও তারণ"। এস্থলে শেষোক্ত গুরুই শ্রেষ্ঠ। অধুনা সদ্‌গুরু ও সৎশিষ্য উভয়ই দুর্ল্ভ। গুরুর দায়িত্ব অতি কঠোর—শিষ্যের সকল কর্ম্মের জন্য গুরুকে দায়ী হইতে হয়! যে গুরু জীবনের পথ ফিরাইয়া না দিতে পারেন, তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ সার্থকতা নাই। দীক্ষায় যদি জীবনের পরিবর্ত্তন না ঘটে, তবে সে দীক্ষায় ফল কি? সাধনার পথে প্রথমেই অত্যুগ্র ইচ্ছার প্রয়োজন—তীব্র আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা না থাকিলে এ পথে প্রবেশলাভ অসম্ভব। তীব্র ব্যাকুলতায় শ্রীভগবানই সদ্‌গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া কৃপা করিবেন।

কাহারও কাহারও ধারণা, সিদ্ধ মহাপুরুষ না পাইলে দীক্ষা লইবেন

না। একারণে অধুনা সিদ্ধ মহাপুরুষও বহুল সুলভ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ঈদৃশ মহাপুরুষ অতি দুর্ল্লভ। আমি ভাষার ক—খ—গ চিনি না, অথচ যদি জিদ্ ধরি যে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র শীলের নিকট পড়িব, এ বড় অন্যায় আবদার হয় না কি? কবে বুথ্ সাহেবের মত গণিতজ্ঞ পাইব, তবেই অঙ্ক কষিতে বসিব এ প্রতিজ্ঞা করিলে জীবনে অঙ্ক করা কখনও হইবে না। সুতরাং এস্থলে সদাচারী ক্রিয়াশীল নির্লোভ জাপক ব্রাহ্মণের নিকট মন্ত্র গ্রহণই যুক্তিসিদ্ধ। গৃহস্থের পক্ষে গৃহীর নিকটই মন্ত্র গ্রহণ সুসঙ্গত। সন্ন্যাসী পরমহংসের নিকট মন্ত্র গ্রহণ আজকাল একটা ফ্যাসান্ হইয়াছে—ইহাতে অহঙ্কারের প্রশ্রয় ভিন্ন আর বিশেষ লাভ দেখা যায় না। সাধনায় শ্রীশ্রীবালানন্দ স্বামীর কথায় বলিতে গেলে গুরুকৃপার ন্যায় আত্মকৃপার বিশেষ প্রয়োজন। এই আত্মকৃপা হইতেছে নিজের চেষ্টা বা সাধনা বা ত্যাগবৈরাগ্যের অভ্যাস। নিজের উদগ্র চেষ্টা না থাকিলে গুরু আর কি করিবেন? সাধনার পথ ত' সহজ নহে—ইহা যে শাণিত অসিধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ; "দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"।

পূজা, সাধনভজন বা উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনায় এই কথাটী প্রথম মনে আসে যে পূজা বা উপাসনার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য বিচারে এই কথাটীই উঠে যে আমরা স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। আমাদের স্বরূপ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অপাপবিদ্ধ, সত্য নিত্য সনাতন, সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ শিবস্বরূপ, আর আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা মায়ামলিন, বাসনা কামনা-বদ্ধ, ভয়ভাবনাবিষ্ট, ত্রিতাপতপ্ত আধিব্যাধিজ্বালাসমাকুল, পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিবিশিষ্ট, জরামরণক্লিষ্ট অজ্ঞান ও দুঃখে সমাচ্ছন্ন। মূলে যাহা বিরাট, এক্ষণে তাহা ক্ষুদ্র ও পরিচ্ছিন্ন—এই অবস্থায় আমাদের স্বরূপে ফিরিতে হইবে; দুঃখের জ্বালা দূরে ফেলিয়া আনন্দের অবস্থায় ফিরিতে হইবে।

ইহার জন্য সাধনাই প্রকৃত সাধনা—দেবতার আরাধনা, পূজা ও উপাসনা। এই স্বরূপে ফিরিবার জন্য নানা মত ও নানা পথ, নানা মন্ত্র ও তন্ত্র ঋষিগণ উপদেশ করিয়াছেন, সেই বিরাট ব্রহ্মের ধারণা ও সাধারণ জীবের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া অরূপের রূপ কল্পিত হইয়াছে এবং তাহার আরাধনা বা পূজা বিহিত হইয়াছে।

শ্রীভগবানের আরাধনায় মানব ত্রিতাপজ্বালা এড়াইয়া চতুর্বর্গ লাভ করিতে পারে। তিনি অরূপ হইলেও সাধকের হিতার্থে রূপগ্রহণ করেন, নির্গুণ হইলেও সগুণ হ'ন, কারণ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মে সকলই সম্ভব। তিনি স্ত্রী পুরুষ কুমারী হন—তিনি নানারূপ, নানা অবতারত্ব স্বীকার করেন। শ্রীভগবানের অব্যক্তোপাসনা যে কঠোর তিনি তাহা স্বমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন—

ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ (গীতা)

যিনি যেই মূর্ত্তিতে অর্চ্চনা করুন, সকলই তাহাতে সমর্পিত হয় এবং তিনি সাধকের শ্রদ্ধা দৃঢ় করিয়া তাহাকে পূর্ণকাম করেন।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

অন্যত্র

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

শ্রীভগবানের দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই, তিনি সর্ব্বভূতে সর্ব্বদাই কৃপাময়, তাঁহার আশ্রয় লইলে নিত্যশান্তি ও লাভ ঘটে।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

—গীতা ৯। ২৯—৩৪

অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতেই সমভাব—আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই, যাহারা আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগের মধ্যে থাকি এবং তাহারাও আমার মধ্যে থাকে। অতি সুদুরাচার ব্যক্তিও অনন্যশরণ হইয়া যদি আমার উপাসনা করে, সে সাধু হইয়া যায়, যেহেতু সে উত্তমকার্য্যই করে। সেই ব্যক্তি সত্বর ধর্ম্মাত্মা হয় ও চিরশান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়, ইহা স্থির জানিও যে আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না। আমাকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এবং নীচযোনি ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত উত্তমা গতি লাভ করে। ভক্তিসম্পন্ন পবিত্রবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজর্ষিগণ যে আমায় লাভ করিবে তদ্বিষয়ে আর কি বলিব? এই অনিত্য দুঃখপূর্ণ

লোকে আসিয়া আমার ভজনা কর। আমার প্রতি একচিত্ত হও, আমার পূজা কর, আমায় নমস্কার কর। মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে—

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী॥

তিনি প্রসন্না হইলে কৃপাপূর্ব্বক মানবের মুক্তির হেতু হ'ন—সেই সনাতনী পরাবিদ্যারূপা মানবের মুক্তির হেতুভূতা হন।

আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।

সেই দেবী আরাধিতা হইলে ঐহিক (ভোগ) পারত্রিক (স্বর্গ) সুখ ও মোক্ষ (অপবর্গ) দান করেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই দেবতার অধীন—সমস্তই ঈশ্বরানুগ্রহের ফল। যে যেরূপ চাহে—সে সেইরূপ পাইয়া থাকে।

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না॥

সর্ব্বাভীষ্টদাত্রী ভগবতী যাহার উপর প্রসন্না হ'ন, তাহার জনপদসমূহে যশোলাভ ঘটে, তাহার ধনলাভ হয়, তাহার যশঃ ও ধর্ম্ম ক্ষয় পায় না। তাহারা ধন্য হয় এবং তাহাদের পুত্র, ভৃত্য, কলত্র বিনীত ও শিক্ষিত হয়। ইহাই প্রকৃতপক্ষে অর্থকাম লাভ।

পুনশ্চ, ধর্ম্মফল দেবী দুর্গার প্রসাদেই লাভ হয়। তদ্যথা—

ধর্ম্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্মা
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতীকরোতি।
স্বর্গং প্রযাতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন॥

হে দেবি, তোমার প্রসাদে সম্মানভাজন ও সুকৃতিলোক ধর্ম্মাচরণ করে, তাহার ফলে স্বর্গলাভ করে। তুমিই লোকত্রয়ে ফলদাত্রী।

উপাসনা সগুণ ও নির্গুণ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, বাহ্য ও মানস ভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞানযোগী বা অব্যক্তোপাসকগণ নির্গুণ, নিরাকার ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপাসনা করেন। এই অব্যক্তের ধ্যান বড় কঠিন; মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শ্রীসদাশিব বলিতেছেন—

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং সরূপারূপভেদতঃ।
অরূপং তব যদ্ধ্যানমবাঙ্মানসগোচরম্।
অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্তমিদমিত্থং বিবর্জ্জিতম্॥

সেই অবাঙ্মানসগোচরের যে ধ্যান, তাহাই অরূপের ধ্যান। তাহা বড় কঠোর—

অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্বহুসমাধিভিঃ॥

সুতরাং সাধারণের পক্ষে স্থূল বা বাহ্যপূজার প্রয়োজন এবং তাহার প্রতি মন লইবার জন্য প্রতীকোপাসনা বিহিত হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে জড়োপাসনার বা পৌত্তলিকতার দোষ আরোপ করা হয়—ইহা সম্পূর্ণতঃ ভ্রান্ত ধারণা। আমি যখন আমার পিতার আলোকচিত্র প্রণাম করি, তখন আমার পিতাকে প্রণাম করি। এই পিতৃসম্বন্ধেই ঐ আলোকচিত্র বা তৈলচিত্র আদরণীয়। সামান্য প্রস্তরখণ্ড

হইতে অতিসুন্দর প্রতিমা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুই যদি আমার ধর্ম্মভাব জাগাইয়া ভক্তিশ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে পারে, আমরা অবশ্যই তাহার সাহায্য গ্রহণ করিব। এই সকল বস্তু বিশেষভাবে ভাবের উদ্দীপন করে বলিয়া ঋষিগণ এই সকলের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। প্রতিমাকে উদ্দেশ করিয়া ফলমূল, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধপুষ্প, ধূপদীপ প্রভৃতি যাহা দেওয়া হয়, ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন। তিনি অব্যক্তমূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং সাধকের নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করেন। প্রতিমা প্রাণহীন পুত্তল বটে, কিন্তু সাধক সাধনাদ্বারা তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। শালগ্রাম ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড হইলেও সাধক তাহাতে সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ সহস্রশীর্ষাঃ শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান অনুভব করেন। শ্রীভগবান্ যখন সর্ব্বত্র আছেন (ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা), তখন ঐ শিলাখণ্ডে থাকিয়া ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন আমার ভাব অনুভব করিতেছেন। এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য শ্রীভগবান্ প্রহ্লাদের আহ্বানে স্ফটিকস্তম্ভ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। প্রতিমার নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকে না। সাধকের সাধনবলে ও ভক্তিতপস্যার ফলে তিনি প্রতিমায় আবির্ভূত হ'ন। যাহার সাধনা যতটুকু, শ্রীভগবানেরও তদ্রূপ প্রকাশ ঘটে। যথায় এই ভক্তিসাধনার অভাব, তথায় জড়মতি সাধকের ন্যায় প্রতিমাও জড় থাকিয়া যায়। প্রতিমাপূজার প্রধান কথা ভক্তি ও সাধনা; যখন সাধক সাধনার উচ্চভূমিতে আরূঢ় হ'ন, তখন তাঁহার আর বাহ্য উদ্দীপনার প্রয়োজন হয় না। তখন তিনি আত্মারাম হইয়া, সর্ব্বদা নিত্যযুক্ত হইয়া থাকেন এবং সর্ব্বত্রই বাসুদেবের দর্শনলাভ করেন। প্রতিমাপূজাদ্বারা আমার সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি যেমন ভগবদ্রসে নিমগ্ন হয়, এমন আর অন্যপ্রকারে হয় না। চক্ষুঃ সেই অরূপের রূপ

দেখিয়া তৃপ্ত হয়, মস্তক তাহার চরণে নত হইয়া সার্থক হয়, হস্ত তাঁহার পূজা করিয়া কৃতার্থ হয়, চরণ তাঁহার মন্দিরে গমনপূর্ব্বক চরিতার্থ হয়, ঘ্রাণ তাঁহার পাদপদ্মসৌরভ লইয়া তৃপ্ত হয়, জিহ্বা তাঁহার প্রসাদলাভ করিয়া সরস হয়—সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া ধন্য হয়। স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা যথার্থই বলিয়াছেন—

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

(ভাগবত ১০।১৪।৪)

অর্থাৎ যাহারা মঙ্গলজনক ভক্তি ত্যাগপূর্ব্বক কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, তাহারা ধান্যত্যাগপূর্ব্বক শুধু তুষ লইয়া কেবল ক্লেশ পাইয়া থাকে।

সগুণ, ব্যক্ত বা সাকার উপাসনারও নানা ভেদ এবং নানা ক্রম আছে। সগুণ উপাসনা পুনশ্চ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপিচৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধিরাজসম্॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণং।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥

—গীতা ১৭।১১—১৩

সুতরাং যজ্ঞ বা পূজা তিন প্রকার—প্রথমতঃ সাত্ত্বিক, ইহাতে (১) ফলাকাঙ্ক্ষা নাই (২) বিধিসম্মত অর্থাৎ শাস্ত্রপূত (৩) একাগ্রশ্রদ্ধা-সম্পন্ন। দ্বিতীয়তঃ—রাজসিক পূজা—ইহা (১) ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত, (২) দম্ভনিমিত্ত—কিন্তু ইহাতে ভয়ভক্তি আছে এবং ইহা শাস্ত্রসম্মত। তৃতীয়তঃ তামসপূজা—ইহাও অশাস্ত্রীয় (১) অন্নদানাদিহীন। (২) শ্রদ্ধা-শূন্য (৩) অমন্ত্রক ও (৪) অদক্ষিণ—এই পূজায় আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়া দূরের কথা, ইহাতে ক্ষতি ও অধঃপতন ঘটে। অসভ্য বর্ব্বর জাতির মধ্যে ঢাকঢোল বাজাইয়া পশুবধপূর্ব্বক উন্মাদনৃত্য বা মদ্যপানপূর্ব্বক কোলাহল—এই তামসব্যাপার; কেবল দেবতার নাম সম্পর্কযুক্ত বলিয়া ইহাকে যজ্ঞ বা পূজা, এই নাম দেওয়া হইয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি যাহাতে ভক্তি বা শ্রদ্ধা নাই, তাহা পূজা, উপাসনা বা সাধনার নাম পর্য্যন্ত পাইতে পারে না। শ্রীভগবান্ কিছুই চাহেন না—তিনি চাহেন ভক্তি এবং তদুদ্দেশ্যে ত্যাগ। দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগই যজ্ঞ—কিন্তু এই যজ্ঞের মূলে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না থাকিলে জপ, তপঃ, পূজা, আরাধনা, শৌচ, ব্রত, তীর্থ, দান, ইষ্ট, পূর্ত্ত সকলই বৃথা।

মন্ত্রযোগের বা সমন্ত্রক পূজার ষোড়শ অঙ্গ কল্পিত হইয়াছে। মন্ত্রযোগসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়—

> ভবন্তি মন্ত্রযোগস্য ষোড়শাঙ্গানি নিশ্চিতম্।
> যথা সুধাংশোর্জায়ন্তে কলাঃ ষোড়শ শোভনাঃ॥
> ভক্তিশুদ্ধিশ্চাসনং চ পঞ্চাঙ্গস্যাপি সেবনম্।
> আচারধারণে দিব্যদেশসেবনমিত্যপি॥
> প্রাণক্রিয়া তথা মুদ্রা তর্পণং হবনং বলিঃ।
> যাগো জপস্তথাধ্যানং সমাধিশ্চেতি ষোড়শ॥

এই ষোড়শ অঙ্গ—(১) ভক্তি (২) শুদ্ধি (৩) আসন (৪) পঞ্চাঙ্গসেবন (৫) আচার (৬) ধারণা (৭) দিব্যদেশসেবন (৮) প্রাণক্রিয়া (৯) মুদ্রা (১০) তর্পণ (১১) হবন (১২) বলি (১৩) যাগ (১৪) জপ (১৫) ধ্যান (১৬) সমাধি। এই সকল বিষয়প্রথম কথা পূজার প্রাণ ভক্তি, ভক্তিহীন পূজা সর্ব্বপ্রকারে বিফল। ভক্তির উচ্চ অবস্থা প্রেম। প্রেমের অবস্থায় সাধকের বিধিনিষেধ জ্ঞান থাকে না—তাহা ঈশ্বরে পরাপ্রীতি বলিয়া খ্যাত; ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা সমাধি। পূজার দ্বিতীয় কথা—শুদ্ধি; শুদ্ধ হৃদয়ে দেবতার আরাধনা করিতে হয়। বাসনাকামনা-কলুষিত চিত্তে দেবপূজা হয় না; 'আমি আমার' বুদ্ধি বর্জ্জনপূর্ব্বক 'আমি তোমার' বুদ্ধি না আনিলে পূজায় অধিকার জন্মে না। অহংত্যাগ ও দীনতা সাধনার মূল, দীনতাবুদ্ধি না জাগিলে পূজা হয় না। আমি দীন, হীন, আর্ত্ত, সাধনভজনহীন, জ্ঞানশূন্য, তুমিই পিতা, মাতা, শরণ, সুহৃৎ—তুমি ভক্তি দাও, জ্ঞান দাও, প্রেম দাও, তোমার চরণে শরণ লইলাম, আমার ক্ষমতা নাই, তুমি আমাকে তোমায় ভালবাসিতে শিখাও। আমার আমিত্ব তোমার চরণে বিসর্জ্জন দিলাম—তুমি আমাকে তোমার করিয়া লও, "কৃপয়া মামাত্মসাৎ কুরু"।

আত্মস্থান মন্ত্রদ্রব্যদেবশুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।
যাবন্ন কুরুতে দেবি তস্য দেবার্চ্চনং কুতঃ॥

আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দেবশুদ্ধি না করিলে পূজা হয় না। ভাবশুদ্ধ সাধক তীর্থাদি বিশুদ্ধ জলে স্নান করিয়া ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গন্যাসাদি করিলে আত্মশুদ্ধি হয়। দ্বিতীয়তঃ সুমার্জ্জিত গোময়লিপ্ত স্থানে চন্দ্রাতপ, ধূপদীপাদি পরিশোভিত পঞ্চবর্ণচূর্ণদ্বারা চিত্রিত করিলে

স্থান শুদ্ধ হয়। তৃতীয়তঃ, মন্ত্রপুটিত করিলে মন্ত্রশুদ্ধি হয়। মন্ত্রযোগে পুষ্পাদি শুদ্ধ হয় এবং তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দ্বারা দেবতাশুদ্ধ করিতে হয়।

তৃতীয় আসন। যাহাতে মনঃস্থির হয় এবং শরীরের সুখবোধ হয়, তাহাই আসন। যোগমার্গে চিত্তজয় ও সাধনার জন্য নানা আসনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সাধনার পক্ষে কুশ, কম্বল, চৈল বা মৃগচর্ম্মের আসন প্রশস্ত। প্রথমে কুশাসন পাতিয়া তাহার উপর মৃগচর্ম্ম ও পরিশেষে রেশমের আসন পাতিয়া তাহার উপর জপাদি করা সিদ্ধিপ্রদ। সাধকের অধিকারভেদে আসনভেদ কথিত হইয়াছে। ভূমি, কাষ্ঠ, পাষাণ, তৃণ প্রভৃতির আসন বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। আসনগ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রপ্রয়োগে আসনশুদ্ধ করিতে হয়। সাধকের পক্ষে পঞ্চাঙ্গসেবন অর্থাৎ (১) গীতা (২) সহস্রনাম (৩) স্তব (৪) কবচ (৫) হৃদয়পাঠ বিশেষ হিতকর। প্রত্যেক দেবদেবীর এই সকল সাম্প্রদায়িক গীতা সহস্রনাম প্রভৃতি আছে।

চতুর্থতঃ, আচার—ইহা সম্প্রদায় অনুসারে স্থিরীকৃত হয়। সদাচার সর্ব্বসম্প্রদায়ের পালনীয়। ইষ্টে মনঃসংযোগই ধারণা। যোগশাস্ত্রে ভ্রূমধ্যে, মস্তকে প্রাণবায়ুর ধারণকে ধারণা বলা হইয়াছে। যাহার মধ্য দিয়া দেবতার আবির্ভাব হয়, তাহার নাম দিব্যদেশ।

শ্রীভগবানের সর্ব্বত্র বিকাশ থাকিলেও তাহার বিশেষ প্রকাশ-স্থল শাস্ত্রে নির্ণীত আছে। শালগ্রাম, শিবলিঙ্গ, তীর্থস্থান, যন্ত্র, প্রতিমা, প্রতীক, বহ্নি, অম্বু, ঘট, পট স্থণ্ডিল, পীঠ, নাভি, হৃদয়, মূর্দ্ধায় শ্রীভগবানের বিশেষ বিকাশ ঘটে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান বলিতেছেন,

সূর্য্যোঽগ্নি ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্রপূজাপদানি মে॥

সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা, সর্ব্বভূত—এই একাদশ স্থান তাঁহার অধিষ্ঠানক্ষেত্র। পূজার অষ্টম কথা—প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়—ধ্যান ধারণার সুবিধা ঘটে। ইহা গুরুমুখগম্য—সুতরাং অত্র লিপিবদ্ধ হইল না। গ্রন্থ দেখিয়া বা বুজরুগের পাল্লায় পড়িয়া অনেকে প্রাণায়াম করিতে গিয়া নানা রোগে পতিত হ'ন। অনন্যচিত্তে নামজপই উত্তম প্রাণায়াম। ভক্তিভাবে নামজপই সাধারণপক্ষে সুন্দর বিধান, 'ভক্তিযোগো নিরুপদ্রবঃ'। সাধনায় নানা মুদ্রার ব্যবহার আছে—এই সকল মুদ্রায় দেবতার বিশেষ প্রীতি হয়। বিশেষ বিশেষ দেবতার বিশেষ মুদ্রা একান্ত প্রীতিপ্রদ। দেবতার তর্পণ, হোম, বলি ও যাগ কর্ম্মকাণ্ডের বিশেষ ব্যাপার—এই সকল গুরুমুখে জ্ঞাতব্য। পূজার শেষ কথা জপ ও সমাধি। মননের দ্বারা যাহা ত্রাণ করে, তাহাই মন্ত্র। মন্ত্র জপের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়, কিন্তু সজীব মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্রে সিদ্ধি হয় না।

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।
শতকোটী জপেনাপি তস্য সিদ্ধির্নজায়তে॥

মন্ত্রকে সজীব করিবার নানা প্রক্রিয়া আছে, তাহা গুরুমুখগম্য। এই সজীব মন্ত্র তিন ভাবে জপ করা যায়। মানসিক জপ—ইহা জপের সময় অপরের বা নিজের পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, উপাংশু—আপনার শ্রুতিগম্য, কিন্তু অপরের নহে। তৃতীয়তঃ, বাচনিক; ইহা বাক্যদ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ। জপের সময় জাপকের মনে ইষ্টদেবের মূর্ত্তি স্ফুরিত হইবে ও আনন্দাশ্রু, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের সঞ্চার হইবে। জপ নির্জ্জনস্থানে, দেবালয়ে, গঙ্গাতীরে, তীর্থস্থানে, অরণ্যে পঞ্চবটীতলে, পর্ব্বতগুহায়, শ্মশানে বা যোগগৃহে করিতে

হয়। জপস্থলে অশুচি ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। পূজাগৃহে কোন বৈষয়িক ব্যাপারের আলোচনা বা চিন্তা না করাই ভাল। স্থান গোময় বা গঙ্গাজল দ্বারা মার্জ্জন ও লেপনপূর্ব্বক তথায় আসন স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে জপ বিধেয়। জপের সহিত দেবতার ধ্যানে অভিনিবেশ বিধেয়—এই একান্ত অভিনিবেশের ফল সমাধি। এই অবস্থায় মনের লয় হয়—ধ্যেয়, ধ্যাতা, ধ্যানরূপ ত্রিপুটী বিনষ্ট হয়; ইহাকেই সমাধি বলে।

মুক্তিই প্রত্যেক সাধনের চরম কাম্য—যাঁহারা ভক্তিমার্গী, তাঁহারা মুক্তি চাহেন না, শ্রীভগবানের চরণই তাঁহাদের একান্ত কাম্য। কিন্তু সংসারের আত্যন্তিক দুঃখ হইতে মুক্তি সকলেই চাহেন। এই জরা, মরণ, দুঃখ ও সংস্থতি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নানা মত ও নানা পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেহ যোগমার্গে, কেহ ভক্তিমার্গে, কেহ জ্ঞানমার্গে, কেহ বা কর্ম্মমার্গে তপস্যা করিতেছেন। যাঁহার যেরূপ অধিকার, তিনি সেই পথে চলিয়াছেন। শ্রীভাগবতে ভগবান্ এইভাবে অধিকারনির্ণয় করিয়াছেন—

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

যাহারা বৈরাগ্যযুক্ত ও কর্ম্মসন্ন্যাসপর তাহাদের জন্য জ্ঞানযোগ, কিন্তু যাহাদের নির্ব্বেদ বৈরাগ্য সমুৎপন্ন হয় নাই তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগ এবং যাহাদের নির্ব্বেদও হয় নাই এবং অত্যাসক্তিও নাই, অথচ ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাদি আছে, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগই প্রশস্ত।

অতিবিরক্তি নিতান্ত দুর্লভ—বেদান্তশাস্ত্রে ও জ্ঞানযোগে অধিকার অত্যন্ত দুর্লভ; যিনি যথাবিধি বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়নপূর্ব্বক বেদার্থ অবগত হইয়া ইহজন্মে বা অন্য জন্মে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনার অনুষ্ঠানদ্বারা সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া নিতান্ত নির্ম্মল ও চারিটী সাধনযুক্ত হ'ন, তিনিই এই মার্গের অধিকারী। এই চারিটী সাধন হইল—

(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক—অর্থাৎ নিত্য পদার্থ ও অনিত্যপদার্থ-জ্ঞান। ব্রহ্মই নিত্য আর সকলই অনিত্য, ইহার বিবেচনা।

(২) ইহামুত্রফলবিরাগ—অর্থাৎ যাবতীয় ভোগ্যবস্তুতে অনাসক্তি, পরলোকাদি ও তদ্বৎ অনিত্য বলিয়া তাহাতে বৈরাগ্য।

(৩) শমাদিষট্সম্পত্তি—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা সমাধান ও শ্রদ্ধা।

শম—গুরুবাক্য বা তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন অন্যান্য কোন বিষয় পর্য্যন্ত শুনিতে অনিচ্ছা বা মনের নিগ্রহ।

দম—ঐরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ।

উপরতি—বিহিত কর্ম্মত্যাগ।

তিতিক্ষা—শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা।

সমাধান—অনুকূল বিষয়ে মনের সমাধান।

শ্রদ্ধা—গুরূপদিষ্ট বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস।

(৪) মুমুক্ষুত্ব—মোক্ষেচ্ছা।

এইরূপ ব্যক্তি গুরুর নিকট গমনপূর্ব্বক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সাধনপূর্ব্বক ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।

জ্ঞানযোগের সাধনা বড় কঠোর, সুপক্ক বৈরাগ্য অতি তীব্র, মুমুক্ষা উৎপন্ন না হইলে এই পথে বিচরণ অসাধ্য; সুতরাং ইতরসাধারণের

পক্ষে কর্ম্মযোগই প্রশস্ত। মন্ত্রযোগ, যাগযজ্ঞ, সকলই কর্ম্মযোগের অধীন। কিন্তু কর্ম্মযোগ সকামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা মুক্তিপ্রদ না হইয়া বন্ধনের হেতু হয়। ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই যদি শ্রীভগবানে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে তিনি তুষ্ট হইয়া মুক্তি দান করেন। পাতঞ্জলদর্শনে ইহাকে ক্রিয়াযোগ বলা হইয়াছে। ইহাই ভগবদ্গীতোক্ত কর্ম্মযোগ—সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণযোগ বা আত্মসমর্পণ যোগই প্রকৃত যোগ—ইহাই কর্ম্মসু কৌশলম্। যাগযজ্ঞ, জপধ্যান, তীর্থব্রত, ইষ্ট, পূর্ত্ত যাহা কিছুই কর—শয়নে স্বপনে, আহারে বিহারে, ভোগে ত্যাগে, সর্ব্বকর্ম্মে সকলই শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে কার্য্য করাই কর্ম্মযোগ।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

অতএব অসক্ত হইয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাও, অসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে পুরুষ মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। নীলকণ্ঠ ভারতী লিখিয়াছেন,—"যে কর্ম্ম ফলাভিসন্ধিতে আরম্ভ করা যায়, সে কর্ম্ম অতি প্রযত্ন সহকারে সম্পন্ন করিলেও তাহাতে ঈশ্বরের তুষ্টি জন্মে না; সে কর্ম্ম কুক্কুর কর্ত্তৃক অবলীঢ় পায়সাদির সদৃশ।" (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন)। ক্রিয়াযোগ বলিতে মহর্ষি পাতঞ্জলি তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান বুঝেন। তপঃ মন্ত্রোক্ত ধর্ম্মপালন, স্বাধ্যায়—শাস্ত্রপাঠ সদাচার ও প্রায়শ্চিত্তাদির সাধন ও ঈশ্বরপ্রণিধানের অর্থ শ্রীভগবানে কর্ম্মসমর্পণ।

জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ বা ভক্তিযোগ সকল যোগেরই প্রথম কথা চিত্তশুদ্ধি। এই চিত্তশুদ্ধির জন্য শাস্ত্রে নানা যোগের বিধান আছে। জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠানমূলক ব্যবস্থা পতঞ্জলির দর্শনে নির্ণীত হইয়াছে।

এই যোগের আটটী অঙ্গ আছে—তাহার ক্রম প্রদর্শিত হইল—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

১। যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ—ইহাই প্রথম সাধন।

২। নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান—দ্বিতীয় সাধন।

৩। আসন—'স্থির সুখমাসনম্'—এই সকল গুরু হইতে শিক্ষণীয়।

৪। প্রাণায়াম—পূরক, রেচক ও কুম্ভক ভেদে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম—ইহা গুরুমুখগম্য।

৫। প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়নিরোধই প্রত্যাহার এই পাঁচটী বহিরঙ্গ সাধন।

অন্তরঙ্গসাধন :—

৬। ধারণা—দেশবিশেষে চিত্তের ধারণা। ইহা দেবতাত্মক হইতে পারে এবং মূলাধার, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূমধ্য, সহস্রার প্রভৃতি স্থানে চিত্তের স্থিরতাও হইতে পারে।

৭। ধ্যান—ধারণার উচ্চাবস্থাই ধ্যান।

৮। সমাধি—চিত্ত যখন ধ্যেয়ে এক হয়, তখনই সমাধি।

এই পতঞ্জলিপ্রোক্ত যোগও অতি কঠোর বোধ হওয়ায় আর এক প্রকারের যোগ অধুনা যোগিসমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাসের বিশেষ প্রক্রিয়াদ্বারা মনের চাঞ্চল্য নাশ ও সাধনার প্রসার করাই এই যোগের লক্ষণ। এই যোগ হঠযোগ বলিয়া খ্যাত। সাধনায় শরীরই মূল। কিন্তু আমাদের শরীর প্রায়ই সাধনোপযোগী নহে। সুতরাং শরীরশোধনপূর্ব্বক প্রাণায়াম প্রক্রিয়া দ্বারা চিত্তবিক্ষেপ নাশ-

র্বক সমাধিতে মহাবোধ লাভ করিতে হয়। এই হঠযোগ সপ্ত-সাধনাত্মক—

শোধনং দৃঢ়তাচৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবম্।
প্রত্যক্ষঞ্চ নির্লিপ্তঞ্চ ঘটস্থ সপ্তসাধনম্॥

ইহার সপ্তাঙ্গ—শোধন (ষটকর্ম্ম), দৃঢ়তা (আসন), স্থিরতা (মুদ্রা), ধীরতা (প্রত্যাহার), লঘুতা (প্রাণায়াম), প্রত্যক্ষতা (ধ্যান), নির্লিপ্ততা (সমাধি)। এই হঠযোগ গ্রন্থ দেখিয়া শিখিবার নহে। ইহার প্রথম সাধনায় সিদ্ধ হইলে দেহ নীরোগ ও দীর্ঘায়ুঃ হয়। ধৌতি, বস্তি, নেতি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মদ্বারা দেহ সাধনযোগ্য হয়। ষটকর্ম্ম, আসন, মুদ্রা, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম ও ধ্যান—এই সকল গুরুমুখ হইতে জ্ঞাতব্য। ইহা ছাড়া জ্যোতিঃধ্যান ও ষট্‌চক্রভেদনামক তান্ত্রিক প্রক্রিয়া আছে, তাহা লয়যোগ নামে খ্যাত—ইহা গুরুমুখগম্য।

জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে ভক্তিযোগই একান্ত নিরুপদ্রব সহজ ও সরল। ভক্তিযোগ ব্যাখ্যায় মহর্ষি নারদ বলিতেছেন “যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি।” শ্রীভগবান্ ভক্তিতে যেরূপ প্রীত হ’ন, অন্য কোন দ্রব্যে সেই রূপ হন না—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনতি মন্নিষ্ঠা শ্বপকানপি সম্ভবাৎ॥

যাঁহারা বিষয়াসক্ত ও ইন্দ্রিয়জয়ে অশক্ত, তাঁহারাও ভক্তিদ্বারা বিষয়-প্রভাব জয় করিতে সমর্থ হ’ন এবং প্রবল অগ্নি যেমন কাষ্ঠসমূহ ভস্মসাৎ

করে, সেইরূপ শ্রীভগবদ্ভক্তি সকল পাপ ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। তথাহি শ্রীভাগবতে—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়াভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

—ভাগবত ১১।১৪।১৮—১৯

ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বেষামধিকারিণাং ভক্তিযোগঃ প্রশস্যতে। ভক্তিযোগঃ নিরুপদ্রবঃ। ভক্তিযোগান্মুক্তিঃ॥ চতুর্ম্মুখাদীনাং সর্ব্বেষাং বিনা বিষ্ণুভক্ত্যা কল্পকোটিভির্মোক্ষোন বিদ্যতে॥ কারণং বিনা কার্য্যং নোদতি। ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাপি ন জায়তে। তস্মাৎ ত্বমপি সর্ব্বোপায়ান্ পরিত্যজ্য ভক্তিনিষ্ঠো ভব। ভক্তিনিষ্ঠো ভব। মদুপাসকঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ স ভবতি। মদুপাসকঃ পরং ব্রহ্ম ভবতি॥"

পুনশ্চ কলিকালে ভক্তিই যুগোপযোগী পন্থা—

ন তপোভির্নবেদৈশ্চ ন জ্ঞানেনাপি কর্ম্মণা।
হরির্হি সাধ্যতে ভক্ত্যা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ॥
নৃণাং জন্মসহস্রেণ ভক্তৌ প্রীতির্হি জায়তে।
কলৌ ভক্তিঃ কলৌ ভক্তির্ভক্ত্যা কৃষ্ণঃ পুরঃস্থিতঃ॥
অলং ব্রতৈরলং তীর্থৈরলং যোগৈরলং মখৈঃ।
অলং জ্ঞানকথালাপৈর্ভক্তিরেকৈব মুক্তিদা॥
যৎ ফলং নাস্তি তপসা ন যোগেন সমাধিনা।
তৎফলং লভতে সম্যক্ কলৌ কেশবকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যাদি ত্রিযুগে বোধবৈরাগ্যৌ মুক্তিসাধকৌ।
কলৌ তু কেবলং ভক্তির্ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী॥

—শ্রীভক্তিপারিজাতঃ।

এই ভক্তিই কলিযুগে নিষ্কণ্টক পন্থা। এই ভক্তি সা ত্বস্মৈ পরমপ্রেম-রূপা (নারদ), বা সা পরানুরক্তিরীশ্বরে (শাণ্ডিল্য)—শ্রীভগবানে একান্ত প্রেম বা একান্ত অনুরক্তিই ভক্তি। এই ভক্তি অহৈতুকী ও অনিবার্য্য বা অপ্রতিহত ; ইহাতে ফলানুসন্ধান নাই, কেবল তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা। তথাহি শ্রীভাগবতে—

স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতোভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চযদহৈতুকম্॥
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্॥
ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামোলাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থোযশ্চেহকর্ম্মভিঃ॥
বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥

অত পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥
তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্য কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ॥
যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্॥
শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব কথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃ শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥
অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্॥

—ভাগবত ১।২।৬—২২

ইহার ফলিতার্থ এই—শ্রীভগবানে ভক্তিই পুরুষের পরম ধর্ম—এই

ভক্তিও ফলাভিসন্ধানরহিত (অহৈতুকী) ও বিঘ্নাদিশূন্য (অপ্রতিহতা)। বাসুদেবে প্রযুক্ত ভক্তি শীঘ্র জ্ঞান ও বৈরাগ্য উৎপাদন করে। ধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি ভগবদ্ভক্তি না জন্মে তবে সে ধর্ম্মানুষ্ঠান বৃথা শ্রম মাত্র। অর্থের জন্য ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মুক্তি। ধর্ম্মের ফল অর্থ, কাম ও ইন্দ্রিয়প্রীতি নহে। তত্ত্বজিজ্ঞাসাই প্রথম কর্ত্তব্য—কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গসুখও কাম্য নহে। ধর্ম্মই তত্ত্ব নহে অবিনাশী অদ্বয়জ্ঞানই তত্ত্ব। এই অদ্বয়তত্ত্বকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ ভগবান্ বলিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ বেদান্তশ্রবণপূর্ব্বক জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিদ্বারা আত্মায় সাক্ষাৎলাভ করেন। অতএব বর্ণাশ্রম পালনপূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রীভগবানের প্রীতিসাধনই ধর্ম্ম। শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন, ধ্যান, পূজা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের ধ্যানরূপ অসিদ্বারা কর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন হয়। তীর্থসেবা, পুণ্যানুষ্ঠান, হরিকথা শ্রবণে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির শ্রদ্ধা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাঁহার কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন পরম পুণ্যদায়ক, তাঁহার কথা শ্রবণ করিলে তিনিই হৃদয়স্থ হইয়া সাধুব্যক্তিগণের সুহৃদ্ রূপে সকল অমঙ্গল দূর করেন। নিত্য ভাগবতসেবায় (ভক্ত বা ভাগবতশাস্ত্র সেবায়) সকল অমঙ্গল নষ্ট হয় এবং অমঙ্গল দূর হইলে শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি জন্মে। ভক্তি আসিলে রজঃ, তমঃ নষ্ট হয়—কামলোভ বিদূরিত হয়, মনঃ শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে মনঃ ভক্তিযোগে প্রসন্ন হইলে আসক্তিশূন্য মনে ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান জন্মে। তখন শুদ্ধচিত্ত মনে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার ঘটিলে দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট হয়। এইজন্য মনীষিগণ পরমানন্দে শ্রীভগবান্ বাসুদেবে আত্মপ্রসাদনী (মনঃ শোধিনীমিতি শ্রীধরঃ) ভক্তি করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভক্তিযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাতে বর্ণ, আশ্রম, কুল বা আচার অবশ্য পালনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এ

সকলের উদ্দেশ্য শ্রীভগবানের প্রীতিসাধন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

মযোদিতেষ্ববহিতঃ স্বধর্ম্মেষু মদাশ্রয়ঃ।
বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ॥

ভক্তিযোগমার্গের ক্রম এইভাবে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে—

১। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সদাচারপালন
২। সৎসঙ্গ
৩। ভগবৎকথাশ্রবণ
৪। অনুকীর্ত্তন
৫। পূজা-নিষ্ঠা ও স্তবস্তুতি
৬। পরিচর্য্যায় আদর
৭। সর্ব্বাঙ্গদ্বারা অভিবন্দন
৮। ভক্তপূজা
৯। ভগবানে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ
১০। সর্ব্বভূতে ভগবদ্বুদ্ধি।

শ্রীভাগবতের ভাষায়—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণেতি সমর্পয়েৎ তৎ॥ (কর্ম্মফলত্যাগ)

* * *

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।

গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গ ॥ (অনুকীর্ত্তন)

*　　*　　*

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশোদ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥ (সর্ব্বভূতে ভগবদ্বুদ্ধি)

*　　*　　*

মল্লিঙ্গ মদ্ভক্তজন দর্শনস্পর্শনার্চনম্।
পরিচর্য্যাস্তুতিঃপ্রহ্ব গুণকর্ম্ম নুকীর্ত্তনম্ ॥
মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যোনাত্মনিবেদনম্ ॥
মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মমপর্ব্বানুমোদনম্।
গীততাণ্ডববাদিত্র গোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ ॥ (পূজানিষ্ঠাদি)

—ভাগ ১১ । ১১ । ৩৪—৩৬

*　　*　　*

মামেকমেব স্মরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যাহ্যকুতোভয়ঃ ॥

—ভাগ ১১ । ১২ । ১৫

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥
সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষদ্ধা যথোচিতম্॥
শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ॥
সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ॥
শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্কায় দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্॥
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎপরস্মৈ নিবেদনম্॥
এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্য্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥
পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথোরতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ,
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।

নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং,
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥
ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্॥

—ভাগ ১১।৩।২১—৩৩

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উপরে যে ভক্তিধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহাই বৈধভক্তি—ইহার পর যে ভক্তির ক্রম আছে তাহা রাগানুগভক্তি। এই রাগানুগসাধনার বিশেষ ক্রম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রকটীকৃত—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহার জীবনে রাগমার্গে সাধনার চরম পরিণতি দেখাইয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ ভক্তির নয়টী লক্ষণ দেওয়া হয়—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

ইহাই ভক্তির নবধা লক্ষণ। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া যাঁহারা ভয়বিমিশ্র সাধনা করেন, তাঁহারা শান্তরসের উপাসক, কিন্তু ইহা ভিন্ন শ্রীভগবানের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া যাহা উপাসনা, তাহাতে রাগ বা আসক্তির বিশেষ অনুশীলন ঘটে। আমি শ্রীভগবানের দাস—তিনি আমার শরণ, আমি তাঁহার সেবা করিব, আমার জন্ম সার্থক, জন্ম প্রভৃতি আমি তাঁহার দাস, এই যে ভাবনাপূর্ব্বক ভক্তি, ইহাই দাস্য-ভক্তি। দাস্যে মমত্ববুদ্ধি আছে—সেবা ইহার প্রধান লক্ষণ। দাস্যে সম্ভ্রমভাব আছে—সখ্যে তাহা নাই; শ্রীভগবান্ এখানে নিকটতর; কোন সঙ্কোচ নাই, তিনি বড় সুহৃদ্—ব্রজবালক অর্দ্ধভুক্ত ফল শ্রীকৃষ্ণের মুখে তুলিয়া দিতেছেন। কেহ বা ভগবানে পুত্রবৎ স্নেহ করেন—রামলালাকে না খাওয়াইয়া ভক্ত খাইবেন না, তিনি না শুইলে ভক্ত

শুইবেন না। যশোদার বুকচেরা ধন শ্রীকৃষ্ণ—বাৎসল্যের চরম বিকাশ শ্রীযশোদা। সর্ব্বরসের সার মাধুর্য্যরস—এই রসের পূর্ণ বিকাশ মহাভাব ও রসরাজের সম্মিলিত মূর্ত্তি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীশ্রীরাধা মহাভাব, রসরাজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ—এই দুই সম্মিলিত মহাভাবরসরাজ মূর্ত্তি—এই ভাবে শ্রীভগবান্ পরমপতি, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, তিনিই সারসর্ব্বস্ব।

ভক্তিযোগের সাধনা রসের সাধনা, তিনি রসময়, "রসো বৈ স রসং লব্ধা হেবায়মানন্দীভবতি"—এই রস পাইলে আর কিছুই অপেক্ষা তাহাকে করিতে হয় না—ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ আর কিছুই নাই। ইহা মূকাস্বাদনবৎ—যিনি আস্বাদ করিয়াছেন, তিনি ইহার বর্ণনা করিতে পারেন না। ভক্তিরসরসিক শ্রীভগবানের সেবায় এরূপ নিমগ্ন যে তিনি মোক্ষও বাঞ্ছা করেন না।

যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা।
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ ॥

সর্ব্বশাস্ত্রের সারমর্ম্ম শ্রীভগবানে ভক্তি।

ইদং তত্ত্বমিদং তত্ত্বং মোহিতেনৈব মায়য়া।
ভক্তিতত্ত্বং যদা প্রাপ্তং তদা বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥
বারি ত্যক্ত্বা যথা হংসঃ পয়ঃ পিবতি নিত্যশঃ।
এবং ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য বিষ্ণুভক্তিং সমাশ্রয়েৎ ॥

শ্রীশুকদেবও বলিতেছেন—

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য তু পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥ ইতি

॥ ওঁহরিঃ ॥ ওঁ তৎসৎ ॥ ওঁ হরিঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥